# জগতের বাল্য ইতিহাস।

নাসীৎ কিঞ্চন প্রাক্ সৃষ্টে রুন্নত্যুন্মুখিনী হি সা।
নিহিতা বিভুনা সাক্ষাৎ স্ফুটোৎকর্ষপরম্পরা ॥

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।
২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
শকাব্দা ১৮০৭—আশ্বিন।

# ভূমিকা।

এক্ষণে মনুষ্যসমাজের আধুনিক পুরাবৃত্ত এবং বিগত তিন চারি শতাব্দীর উন্নতির বিবরণ পাঠেই অধিকাংশের অনুরাগ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই বর্ত্তমান সভ্যতার সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণের জন্য আদিম অসভ্য মানবগণ যে সমস্ত আয়োজন ও উদ্যোগ করিয়া গিয়াছেন তাহার সংবাদ প্রায় কেহই লইতে চাহেন না। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধানে ও যত্নে এ সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকমধ্যে এ কাল পর্য্যন্ত স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; "জগতের বাল্যইতিহাস" দ্বারা এই অভাব কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ হইবে এবং তরুণ বয়স্ক শিক্ষার্থিগণ ইহা পাঠে জ্ঞান ও নীতিসম্বন্ধে যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে ইহা প্রকাশিত হইল। এডওয়ার্ড ক্লড্ নামক জনৈক গ্রন্থকারের প্রণীত "চাইলডহুড্ অব্ দি ওয়ারলড" নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তককে প্রধান অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহা মূল গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। উক্ত পুস্তকে যাহা ছিল না এমনো কোন কোন বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট রহিল। মানবজাতি প্রথমে যখন এখানে আগমন করে তখন তাহারা কি ভাবে কাল যাপন করিত, কিরূপ প্রণালীতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইল এবং তাহাদের জ্ঞান ধর্ম্ম নীতি কি প্রকার নিয়মে বিশুদ্ধ এবং উন্নত হইয়া আসিয়াছে, এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ইহাতে জানা যাইবে। অধুনা তত্ত্বানুসন্ধায়ী জ্ঞানীদিগের দ্বারা এ সম্বন্ধে দিন দিন যে সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে, এবং ইহার বিষয় সকল এক একটি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে এমন আশা করা যায় না, যে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সমস্ত বিস্তারিতরূপে বিবৃত হইবে; যত দূর সংক্ষেপে হইতে পারে তাহাই করা গেল। এইরূপ পুস্তক ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সমূহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, তত্ত্বাবধারক এবং শিক্ষক মহোদয়গণ বিদ্যালয় সমূহের জন্য ইহা পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত করেন এই প্রার্থনা। এরূপ সহজ এবং অল্প মূল্যের বাঙ্গালা পুস্তক এ দেশে এই প্রথম।

# সূচীপত্র।


| বিষয় | | | পৃষ্ঠা |
| --- | --- | --- | --- |
| উপক্রমণিকা | ... | ... | ১ |
| মনুষ্যের প্রথম অভাব | ... | ... | ১৯ |
| প্রথম ব্যবহার্য্য যন্ত্র বা অস্ত্র | ... | ... | ২৩ |
| অগ্নিউৎপাদন | ... | ... | ২৯ |
| রন্ধন এবং রন্ধনপাত্র | ... | ... | ৩০ |
| বাসস্থান | ... | ... | ৩২ |
| ধাতু ব্যবহার | ... | ... | ৩৪ |
| মানবসমাজের উন্নতির সময় | | ... | ৩৯ |
| পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য | ... | ... | ৪২ |
| ভাষা | ... | ... | ৪৬ |
| হস্তলিপি | ... | ... | ৫১ |
| গণিত শিক্ষা | ... | ... | ৫২ |
| মনুষ্যের দেশান্তর প্রস্থান | ... | ... | ৫৩ |
| সমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি | | ... | ৫৫ |
| মনুষ্যসমাজের ভগ্নাবস্থা | ... | ... | ৫৬ |
| সমাজ শাসন | ... | ... | ৬০ |
| নীতি বিকাশ | ... | ... | ৬৮ |
| ধর্ম্মজ্ঞান | ... | ... | ৭৭ |
| উপসংহার | ... | ... | ১০৪ |

# উপক্রমণিকা।

UTTARPARA PUBLIC LIBRARY
জয়কৃষ্ণ সাধারণ পুস্তকালয়
সন ১২৮৩
EST. 1886

এই প্রকাণ্ড ভূমণ্ডলে যত কিছু পদার্থ আমরা দেখিতেছি ইহাদের প্রত্যেকের এক একটী আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। আমাদের পদতলস্থ ফলশস্যপ্রসবিনী এই ভূমিখণ্ড, ভূগর্ভনিহিত লৌহ স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ ধাতুর আকর, নয়নস্নিগ্ধকর হরিদ্বর্ণ বনরাজি, অসংখ্য প্রকার কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী, এবং কালত্রয়দর্শী বুদ্ধিবিবেকসম্পন্ন জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, এ সকলের উৎপত্তি স্থিতি এবং উন্নতি-বিষয়ক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে যে কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে তাহা নহে, এতদ্দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অশেষ করুণা এবং অনন্ত গুণ কৌশলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পথপার্শ্বস্থ অতি ক্ষুদ্র উপলখণ্ড এবং একটী সামান্য বৃক্ষপত্রের মধ্যে জ্ঞানীরা কত সূক্ষ্ম জ্ঞান এবং শিল্পচাতুর্য্য সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হয়েন। সামান্য জড় বস্তুর মধ্যে যদি এত গভীর পুরাবৃত্ত অবস্থিতি করিল, তবে মহাপ্রাণী চিন্তাশীল মনুষ্যের ইতিহাসতত্ত্ব কিরূপ বিস্ময়কর এবং মনোহর তাহা একবার সকলে আলোচনা করিয়া দেখ। পৃথিবীর কোন পুরাতন কিম্বা কোন আধুনিক সভ্য জাতির ইতিহাসমধ্যে নানাবিধ ঘটনা পাঠ করিয়া আমরা কতই না জ্ঞান এবং সন্তোষ লাভ করি, কিন্তু যে ইতিহাস পাঠ করিলে ইতিহাসের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়, যাহাতে

আমরা মনুষ্যজাতির আদিমাবস্থা অবগত হইতে পারি, তাহা আবার আরও চমৎকার এবং অদ্ভুত ব্যাপার। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর পুরাবৃত্তের মূলতত্ত্বসম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, মনুষ্যের জ্ঞানদৃষ্টি ভূতকালের গর্ভস্থ প্রচ্ছন্ন ঘটনাসকল বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে যত দূর দেখিতে পাইয়াছে, তাহারই সহায়তা লইয়া মানবজাতির শৈশবাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের ক্রমোন্নতির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই গ্রন্থে লিখিত হইবে।

ভূতত্ত্ববিদ্যা দ্বারা এক্ষণে ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে আমাদের অধিষ্ঠানভূতা এই পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবার বহুকাল পূর্ব্বে এক প্রকার উত্তপ্ত তরল পদার্থ ছিল। সেই পদার্থরাশি বিধাতার নিয়মচক্রে অনন্ত আকাশ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে শীতল হইয়া ক্রমে স্তরে স্তরে এই বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। উষ্ণ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহার উপরে যেমন সর পড়ে, তেমনি উক্ত অগ্নিময় তরল পদার্থের উপরিভাগ কঠিন স্তররূপে পরিণত হইয়াছে। উত্তপ্ত তরল পৃথিবীর গাত্রে যে অনন্ত বাষ্পপুঞ্জ অবস্থিতি করিত তাহাই শেষ সমুদ্রের আকার ধারণ করে। এখন যেখানে কাননবেষ্টিত অত্যুচ্চ গিরিচূড়া নয়নগোচর হইতেছে সে স্থান হয়ত এক সময় দিগন্তব্যাপী মহা জলধির ভীষণ কল্লোলে বিকম্পিত হইত। বিধাতার সৃষ্টিক্রিয়া কি অননুমেয় অদ্ভুত! একটি লোকও তখন ছিল না যে তাহা দেখে। সৃষ্টিকর্ত্তা আপনার কার্য্য দর্শনে আপনিই আমোদিত হইতেন। সেই বিশ্বনিয়ন্তার পরমাশ্চর্য্য সুকৌশলে

ক্রমে ইহা প্রকাণ্ডদেহধারী জীবজন্তুদিগের আবাসস্থান হইল। তদনন্তর কিছুকাল পরে আমাদিগের আদি পিতা মাতাগণ এখানে আগমন করিলেন। পূর্ব্বে যে বিস্তীর্ণ অসমতল ভূভাগ অযত্নসম্ভূত বৃক্ষলতায় পরিবৃত হইয়া হিংস্রক জন্তু ও পশু পক্ষিদিগকে আশ্রয় দান করিত, এক্ষণে তাহা বিচিত্র সৌধমালায় সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মনুষ্য জাতির লিখিত পুরাবৃত্তের কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আদিম মনুষ্যগণ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। আমরা কোথা হইতে কিরূপে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তাহা কেবল সেই পুরাতন পিতামহ ঈশ্বরই জানেন।

এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলেন জড় পরমাণু এবং জড়শক্তি এই দুইটী অনাদিকাল হইতে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের আরম্ভ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফরাসীদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিত লাপ্লাস্ বলেন, প্রথমে একবার এই দুই পদার্থকে ইচ্ছার স্বাধীন বল দ্বারা চালিত করা হইয়াছে, পরে সেই গতিবেগ অনন্তকার্য্যকারণশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া ক্রমাগত চলিয়া আসিতেছে। আধুনিক জড়বাদমতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের মতে উক্ত জড়ীয় শক্তি এবং পরমাণুপুঞ্জকে প্রথমে একবার গতিবেগে নিক্ষেপ করিবার জন্য ইচ্ছা অথবা স্বাধীন ইচ্ছাবিশিষ্ট একটী জীবের প্রয়োজন, কিন্তু সেই ইচ্ছা সৃষ্টির মূলপদার্থ সৃজন করিতে সক্ষম নহে, কেবল তাহার গতি

বিধান করে মাত্র। তাঁহারা এ কথাও বলেন, ইচ্ছা দ্বারা যেমন মূলপদার্থ প্রথমে বেগগামী হইতে পারে, তেমনি উত্তাপ, তড়িৎ এবং রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারাও সে কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে আপনাপনি সৃষ্টিপ্রক্রিয়া আরম্ভ হওয়াও সম্ভব। পদার্থবিদ্যা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, যে সকল উপাদানের বল ও উপযুক্ততা অধিক তাহারা দুর্ব্বল অনুপযুক্তদিগকে বিনাশ এবং বিদূরিত করিয়া প্রাকৃতিক ক্রিয়ার উন্নতি এবং বিচিত্রতা উৎপাদন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার উন্নতির সোপানে এই রূপে আপনাপনি অনুপযুক্ততার ধ্বংস এবং উপযুক্ততার সংরক্ষা ও বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। মানবসমাজেও বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেরা দুর্ব্বল অবোধদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে। অরণ্যমধ্যে বলিষ্ঠ পশুরা দুর্ব্বল নিরীহদিগকে আহার করিতেছে। "বল যার অধিকার তার" স্বভাবের এই নিয়ম। অতএব এ প্রকার নিয়মে যদি সৃষ্টিকার্য্যের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইল তবে আর ইচ্ছাবিশিষ্ট আদিশক্তি ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা রহিল না। এক্ষণকার কালের অনেক নিরীশ্বরবাদী পণ্ডিতের এই রূপ মত। যাঁহারা কিছু অধিক উৎসাহী, তাঁহারা বলেন, বাহ্যজগতের নিয়মের মধ্যে যে অভিপ্রায় এবং বুদ্ধির কার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা এবং মনুষ্যের মানসিক ক্রিয়া সমস্তই উক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। অনুপযুক্ত সামান্য কারণে উপযুক্ত সুন্দর কার্য্যফল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। মানবের ক্ষুদ্র জ্ঞানদৃষ্টি আর অধিক দূর যায় না বলিয়া যে সৃষ্টিকে স্রষ্টা হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে হইবে ইহা উন্নত জ্ঞানের অনুমোদিত নহে। জড়শক্তিই হউক, আর জ্ঞানশক্তিই হউক, উভয় শক্তির মূলেই সেই স্বয়ম্ভু আদিশক্তি পরমেশ্বর বর্ত্তমান। তিনি কারণের কারণ। জড়শক্তি এবং পরমাণু যদি নিত্য পদার্থ হয় তবে তাহাদের সংযোগ বিয়োগে যে জ্ঞানের কার্য্য উৎপন্ন হইতেছে সে জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? অবশ্য তাহা কোন জ্ঞানীর জ্ঞান। অতএব স্বভাবের মধ্যে যে বুদ্ধি কৌশল, শিল্পনৈপুণ্য, মঙ্গলাভিপ্রায় আমরা দেখিতেছি তাহা কোন বুদ্ধিমান্ মহাপুরুষের কার্য্য সন্দেহ নাই। এই জগতের মধ্যে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলভাবের যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাইতেছি। তাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্টির মূলপদার্থ সৃজিত হইয়াছে এবং তাঁহারই বলে সকল স্থিতি করিতেছে। কেবল জড় পরমাণু এবং প্রাকৃতিক অন্ধশক্তির যোগাযোগে কি এমন সুন্দর জগৎ এবং মানবপ্রকৃতি সমুৎপন্ন হইতে পারে? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই অনেক জড়বাদী পণ্ডিত এক্ষণে বলিতেছেন, বিচিত্র কার্য্য কারণের অভ্যন্তরে এমন এক দুর্জ্ঞেয় শক্তি অবস্থিতি করিতেছে যাহার গূঢ় তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। এই অনামজ্ঞানসম্পন্ন মূলশক্তিকেই সকলে পরমেশ্বর বলে। সেই আদি কারণ ঈশ্বর স্বয়ং জীবনীশক্তি হইয়া সৃষ্টিকার্য্য পরিপোষণ করিতেছেন। এই কারণে আদিম অবস্থার লোকেরা প্রকৃতির

সকল কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিয়া তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিত।

পৃথিবীর আদিমাবস্থা অর্থাৎ ইহার প্রথম সঙ্গঠন বৃত্তান্ত যতদূর জানিতে পারা যাউক আর না যাউক, এক সময় যে ইহাতে মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত এই সমস্ত বিচিত্র রচনা-পুঞ্জের কিছুমাত্র নিদর্শন ছিল না, কেবল জড়প্রকৃতি ও অস্ফুট মানবজ্ঞানের অভ্যন্তরে মনুষ্যের ব্যবহার্য্য এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু বীজ রূপে বিদ্যমান ছিল সহজ-জ্ঞানে ইহা বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্যের আগমনের পূর্ব্বে ধরাতলে মৃত্তিকা ধাতু উদ্ভিদ্ জল বায়ু অগ্নি নিকৃষ্ট জীব জন্তু, এবং নভোমণ্ডলে সূর্য্য চন্দ্র [illegible] নক্ষত্রাদিও সৃজিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরম রমণীয় সরোবর, উপবন, রাজপথ, এবং সুসজ্জিত অট্টালিকাময় জনতাপূর্ণ সুন্দর নগর, বিবিধ প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদিপরিপূর্ণ বিপণীশ্রেণী; কিম্বা নানারসসংযুক্ত অতি সুমিষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যাদিসঞ্চিত প্রকাণ্ড বাণিজ্যাগার ইত্যাদি যাহা কিছু দেখিতেছি প্রথমে ইহার চিহ্ন মাত্র ছিল না। এক্ষণে যে এক খণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিলে পুস্তকার শত শত গ্রন্থের জ্ঞান লাভ করা যায়, এমন এক সময় ছিল যখন ইহার একটী বর্ণও সৃজিত হয় নাই। এই সকল বিদ্যামন্দির, শিল্পাগার, ভজনালয় প্রভৃতি জ্ঞানমন্দিরের একখানি ইষ্টকও যখন নির্ম্মিত হয় নাই, তত্ত্বদর্শী মহাবুদ্ধি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত, গুরু শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণের আদি পুরুষগণ যৎকালে বর্ণজ্ঞান শিক্ষা করেন নাই, বিপুলশস্যপ্রসবিনী এই প্রশস্ত সমতল ভূমি

যখন হলসংস্পৃষ্টা হয় নাই, মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীনির্ম্মাণের যন্ত্রসকল যখন কেবল মৌলিক পদার্থের মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, এমন সময় অনন্ত উন্নতিশীল মানব মানবী সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া অবনীমণ্ডলে দর্শন দিলেন। সেই অচিরস্নিগ্ধ ভূমিতলে যখন তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে কি ছিল? অতি সামান্য সম্বল ছিল, অথবা যাহা কিছু আবশ্যক তাহার বীজ ছিল। আমরা বিনা আয়াসে বহু যুগ যুগান্তরের সঞ্চিত পৈতৃক অতুল ধন সম্পত্তি জ্ঞান-রাশি হস্তে পাইয়াও নিজ নিজ বংশ জাতি দেশ ও সমাজসম্বন্ধীয় দুরবস্থা স্মরণপূর্ব্বক কত সময় বিধাতার মঙ্গল সঙ্কল্পে দোষারোপ করি, কিন্তু আদিম মনুষ্যগণের নিঃসম্বল অবস্থার সহিত এখনকার নিতান্ত হীনাবস্থার তুলনা করিয়াও যদি দেখি, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিব যে আমাদের অবস্থা কত অনুকূল।

যখন আদিম মনুষ্যগণ এখানে আসিলেন তখন তাঁহাদের কেবল চক্ষু কর্ণ নাসিকা হস্ত পদ প্রভৃতি কতিপয় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট একটী জড় শরীর, এবং অপরিস্ফুট বুদ্ধি বিবেক প্রীতি স্মৃতি প্রভৃতি কতিপয় মহোপকারী গুণ ও শক্তিসম্পন্ন একটী চৈতন্যময় আত্মা, আর তাহার যন্ত্র-স্বরূপ মহামূল্যবান্ এবং মানব দেহের শ্রেষ্ঠ অংশ মস্তিষ্ক, এই মাত্র সঙ্গে ছিল। তাঁহাদের অন্তরস্থ মনোবৃত্তি নিচয়ের মধ্যে কিরূপ অসাধারণ শক্তিসকল বীজরূপে অবস্থান করিত তাহা তখন তাঁহারা কিছুই জানিতেন না, এবং

বহির্জ্জগতের পঞ্চষষ্টি জাতীয় ভৌতিক পদার্থের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ বিয়োগে যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও অবগত ছিলেন না। তখন তাঁহারা নিজের ছায়া দেখিয়া নিজেরা ভয় পাইতেন, এবং বজ্র বিদ্যুৎ বায়ু বৃষ্টি চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র পর্ব্বত যাহা কিছু দেখিতেন তাহাই অভিনব আশ্চর্য্য রসোদ্দীপক এবং ভয়াবহ বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে আমরা জনসমাজের যে শ্রী সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি তাহা একখানি চিত্রিত ছবিরূপে প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহাদের মনোমন্দিরে বর্ত্তমান ছিল, ক্রমে তাহা দৃশ্যমান আকার ধারণ করিতেছে। প্রথমে এই অপরিস্ফুট পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আর বাহিরের ভৌতিক পদার্থ এই সকল লইয়া তাঁহারা কার্য্য আরম্ভ করেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে এখন এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে সম্পূর্ণরূপে অনন্যসাপেক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইয়াছিল। ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে মনোবৃত্তি ও বাহ্য পদার্থের গুণ সকল বিকসিত হইল, বনবাসী মনুষ্য দেবতার তুল্য হইলেন। মনুষ্যের আদিমাবস্থা কিরূপ ছিল বর্ব্বর অসভ্য পর্ব্বতবাসী মানবগণ অদ্যাপি তাহা বুঝাইয়া দিতেছে। সভ্য উন্নতাবস্থার নিদর্শন আমাদের চক্ষের সম্মুখেই পড়িয়া রহিয়াছে। এক সঙ্গে দুইটা দেখিলে মনে কি আশ্চর্য্য রসেরই অভ্যুদয় হয়! বর্ব্বর ও সুসভ্য জাতির মধ্যবর্ত্তী সময়ের উন্নতির বিবরণ কি বিস্ময়জনক! বীজের সহিত বৃক্ষের, গুড়ের সহিত মিছরির যেরূপ প্রভেদ, বর্ব্বর এবং সভ্য নরের মধ্যে তেমনি গভীর প্রভেদ নয়নগোচর হয়।

এই আদিম মনুষ্য বা মনুষ্যগণ কবে কোথায় কি রূপে উৎপন্ন হইলেন, প্রথমে শিশুর ন্যায় জন্ম গ্রহণ করিলেন, কি একবারে পরিণতবয়স্ক যুবাপ্রকৃতি ধরিয়া আসিলেন, এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার কোন লোক নাই। তখন স্থান কাল জীব ও পদার্থ নিচয়ের নামকরণও হয় নাই। যদি কিছু হইয়া থাকে তাহা বর্ব্বর আদিম মনুষ্যবংশের অস্ফুট ভাষার ভিতরেই ছিল। সুদৃঢ় অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত ডারুইন এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিয়া এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে মূলপদার্থ হইতে ধাতু, ধাতু হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে নিকৃষ্ট জীব জন্তু, নিকৃষ্ট জীব জন্তু হইতে এপ অর্থাৎ কপি অথবা বনমানুষ; সেই কপিকুলশ্রেষ্ঠ বনমানুষ হইতে মনুষ্যের ক্রমবিকাশ হইয়াছে। পণ্ডিত ডারুইনের এই মত শ্রবণে অনেকে হাস্য করেন, কিন্তু তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া অতি গম্ভীর ভাবে এ কথা জগতে প্রচার করিয়াছেন। বানরদেহের গঠনপ্রণালী এবং তাহাদিগের দন্তের সহিত মনুষ্যশরীর ও দন্তের অতিশয় সৌসাদৃশ্য আছে, এবং কোন কোন শ্রেষ্ঠতম বানরজাতির স্বভাবে কিছু কিছু বুদ্ধি ও ভদ্রতার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই জন্য তাঁহার মনে এই বিশ্বাসটী আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। কিন্তু কপিবংশ হইতে যদি মানব জাতির জন্ম হইয়া থাকে, এবং পরমেশ্বর যদি ডারুইনের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারেই জগৎ সৃজন করিয়া থাকেন, তাহাতেও আমাদের বিশেষ কোন আপত্তি বা ক্ষতি কিছু দেখা যায় না; কারণ আমরা এখন আরত কপি নহি! তথাপি ডারুইনের এরূপ

মত সত্য বলিয়া প্রতীত হইবার পক্ষে এই একটী বিশেষ আপত্তি দেখা যাইতেছে যে, যদি কপি কিম্বা বনমানুষ হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে তাহা এখন হয় না কেন? সে সকল পুরাতন আদি পিতামহ বানর-বংশ কি ইহাঁরা নহেন যাঁহাদিগকে অরণ্যে ও পর্ব্বতগহ্বরে কিম্বা জনসমাজে আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি? যদি হন তবে ইহাঁদের গর্ভে এখনও মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিত সন্দেহ নাই। ডারুইন সাহেব যদি এরূপ বলেন যে ইহারা সে পরিবারভুক্ত নহে, তাহারা মনুষ্য প্রসব করিয়া দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পর এখন ক্রমে মনুষ্য হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইলে আমাদের আর বলিবার কিছুই থাকে না; মনুষ্যের আদিবৃত্তান্তসম্বন্ধে তাঁহারও যেখানে গতিরোধ হইল আমাদেরও সেই খানে হইয়াছে। কোন এক জাতীয় উদ্ভিদ, পশু বা পক্ষীশাবকের ক্রমোন্নতি এবং জাত্যন্তর দর্শন করিয়া কিম্বা প্রকৃতির মধ্যে বলবানের জয় দুর্ব্বলের ক্ষয় ইহা দেখিয়া যদি তিনি উদ্ভিদ পশু পক্ষী মনুষ্যদিগের মধ্যে জাতিভেদ একবারে বিনাশ করিতে চাহেন তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যত্ন এবং চেষ্টা করিলে দুর্ব্বল কুৎসিত পশু পক্ষী হইতে বলিষ্ঠ এবং সুন্দর শাবক উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু পক্ষী হইতে কপি, কপি হইতে মানবের উৎপত্তি কি সম্ভব? দুই একটী আকস্মিক্ ঘটনায় কোন সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার ঘটে না। যে যে জাতীয় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী তাহা হইতে সেই সেই জাতীয় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী উৎপন্ন

হইতেছে, মনুষ্যও মনুষ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও আমরা দেখিতে পাই না। অতএব স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মূলতঃ প্রত্যেক জীব জন্তু পশু পক্ষী উদ্ভিদ্ মনুষ্য স্ব স্ব স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র, কেহ কাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় না, হইলেও তাহার উৎপাদিকা শক্তি যে বিলুপ্ত হইয়া যায় অশ্বতর তাহার প্রমাণ। কপি বা বনমানুষের গর্ভে মনুষ্য জন্মিয়াছে কিম্বা জন্মিতে পারে পরীক্ষায় যদি এরূপ কথন কেহ দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে এ কথা বিশ্বাসযোগ্য, নতুবা ইহা কল্পনা মাত্র।

প্রথমে কয় জন মনুষ্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধেও অনেক কল্পিত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন আদিতে কেবল স্ত্রী পুরুষ যুগল, কেহ বলেন কেবল এক পুরুষ বা এক স্ত্রী ছিল, তাহা হইতে ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোন জাতির মধ্যে এ বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ও অলৌকিক কথা প্রচলিত ছিল এবং আছে। কিন্তু সে সমস্তই কল্পনাসম্ভূত প্রবাদ মাত্র। কোন সন্তোষকর যৌক্তিক প্রমাণ এ সম্বন্ধে কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাসাগর গর্ভে যে সকল দ্বীপ আছে সেখানে অসভ্য মনুষ্যগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা এ পর্য্যন্ত কেহই স্থির করিতে পারেন নাই। অতএব প্রথমে এক পুরুষ বা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে, কিম্বা কতকগুলি নর নারী জন্মিয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। ইদানীন্তন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কোন

কোন শব্দের মূল অবলম্বন করিয়া এরূপ বলিয়া থাকেন যে মধ্যআসিয়া হইতে মনুষ্যগণ পশ্চিম ইউরোপে গিয়া বাস করিয়াছে এবং আর্য্য জাতির সংযোগে সে দেশে ইণ্ডোইউরোপিয়ান নামক মিশ্র জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই কারণে জর্ম্মণদিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব বলা যায়। সম্প্রতি এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে আফ্রিকা খণ্ডে মনুষ্যের আদি বাসস্থান ছিল। তিনি বোধ হয় ডারুইনের শিষ্য হইবেন। কারণ, যাঁহারা বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি স্বীকার করেন, আফ্রিকার জঙ্গলবাসী বানরেরা তাঁহাদিগের মতের অনেক পোষকতা করে। কিন্তু ইহা জানা গিয়াছে যে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকার অন্তর্গত কোন কোন স্থান সুসভ্য ছিল। সে যাহা হউক, আসিয়া এবং ভারতবর্ষ হইতে যে লোক ইউরোপে গমন করিয়াছিল তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে মনুষ্য যে শীতপ্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করে নাই ইহা অতি যুক্তিসঙ্গত কথা। মনে কর, মনুষ্য যখন প্রথমে জন্মিল তখন তাহার সঙ্গে গাত্রবস্ত্র ছিল না, অগ্ন্যুৎপাদনের বুদ্ধিও হয় নাই, সুতরাং এমন অবস্থায় তুষারাবৃত শীতল প্রদেশে জন্মিলে সে কেমন করিয়া বাঁচিবে? পশুহনন যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিতে এবং অগ্ন্যুৎপাদন করিতে শিখিয়া তাহার পরে সে শীতল দেশের উপনিবাসী হইয়াছে ইহাই সম্ভব। পশুচর্ম্ম, পসম এবং অগ্নির শৈত্যগুণ নিবারিণী শক্তি যত দিন সে না বুঝিয়াছিল ততদিন তাহাকে উষ্ণপ্রধান দেশে থাকিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তরুণ বয়স্ক পাঠক ! তুমি হয়ত মনে করিতেছ, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা কিছুই আশ্চর্য্যজনক নহে। কারণ তুমি জন্মাবধি চারিদিকে লোকের সমারোহ, জ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার চাকচিক্য, বাণিজ্যের কোলাহল, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির শাসন দেখিয়া আসিতেছ; সুতরাং এখন কোন বিষয় তোমার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা তোমার ঘরে নাই তাহা তুমি দোকান হইতে ক্রয় করিয়া আন। এখন তোমার জন্য কারিগর মিস্ত্রীরা উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে, শিল্পী ও বণিকেরা নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সুন্দর সামগ্রী দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে, তুমি যখন যাহা আহার করিতে ইচ্ছা করিবে পাচক ব্রাহ্মণ তাহা রন্ধন করিয়া দিবে, পুস্তকালয়ে গিয়া তুমি যে কোন বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করিতে পার, ইচ্ছা হইলে ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ দেবতার আরাধনা করিতে পার, স্থানান্তর যাইতে বাসনা হইলে গাড়ী পাল্কী নৌকা জাহাজ ট্রেণ যাহাতে ইচ্ছা তাহাতে চড়িয়া চলিয়া যাও, আবশ্যক হইলে সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে তাড়িৎ যোগে সংবাদ প্রেরণ কর; এখন সমস্ত ভৌতিক পদার্থ তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে, জনসমাজ সঙ্গঠিত হইয়া তোমাকে অনুকূল ঘটনার স্রোতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কাজেই তোমার নিকট এখন কিছুই বিস্ময়োৎপাদক নূতন পদার্থ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, যখন এ সকল কিছুই হয় নাই তখন মনুষ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। এ সমস্ত সুবিধার বস্তু প্রস্তুত হইতে অনেক সহস্র বৎসর

লাগিয়াছে। এখন যে সকল পদার্থ লইয়া তুমি ক্রীড়া করিতেছ, প্রথমে তাহা মহা ভয়ের কারণ ছিল; দৈত্য দানব ভূত প্রেত বলিয়া তাহাদিগকে লোকে বিশ্বাস করিত; তবে কি তোমার এই অবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক নহে?

তোমরা যেমন বড় বড় পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে ক খ শিক্ষা করিয়াছিলে এবং পৃথিবীতে কার্য্যক্ষম হইবার জন্য বস্তুতত্ত্ব অধ্যয়ন কর, আদিম মনুষ্যকে তেমনি করিয়া জ্ঞানশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর শিখিতে হইয়াছে। তোমরা বুঝিতে না পারিলে শিক্ষকের সাহায্য লও, কিন্তু তাহা-দের তেমন সুবিধা ছিল না; তখন সকলেই ছাত্র কেহই শিক্ষক হয় নাই। বিধাতাপ্রদত্ত মস্তিষ্কসঞ্চালন দ্বারা তাহাদিগকে সমস্ত বিষয় বুঝিতে হইয়াছে। কোন্ কার্য্য ক উপায়ে নির্ব্বাহিত হয় এবং কেনই বা হয় ইহা জানি-বার আর অন্য উপায় ছিল না। মানবের জ্ঞানশাস্ত্রের প্রথম বর্ণমালা এইরূপে তাহারা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা মানবপরিবারের ভিত্তিমূল সংস্থাপিত হইয়াছে।

মনুষ্যজাতি প্রথমে অতি অসভ্য ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পৃথিবীর চারিখণ্ডে, বিশেষতঃ ইউ-রোপের মধ্যে পূর্ব্বকার ব্যবহার্য্য এমন সকল যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা এখনও অনেক স্থানে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দ্বীপ ও পর্ব্বত-বাসী অসভ্য মনুষ্যদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা

কোন বন্যজন্তু বিশেষ। ফল মূল আম মাংস তাহাদের আহার, বৃক্ষতলে পর্ণকুটীরে তাহাদের বাস, অর্থাৎ আহার পরিধেয় বাসস্থান সম্বন্ধে পশু অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা অধিক উৎকৃষ্ট নহে। আদিম মনুষ্যগণও এইরূপ অবস্থাপন্ন ছিল।

যদি তোমরা পৃথিবীর বাল্যবিবরণ শুনিতে চাও তাহা হইলে আমার সঙ্গে তোমাদিগকে অতীতকালের বহু সহস্র বৎসর পশ্চাতে যাইতে হইবে; এমন কি ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস লিখিত হওয়ার পূর্ব্বেও তোমাদিগকে যাইতে হইবে। কেন না, একত্র দলবদ্ধ এবং ইতিহাস লিখিত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যকে জ্ঞানপথে অনেক দূর অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। সুতরাং এমন বহুশতাব্দী কাল চলিয়া গিয়াছে যে সময়ের উন্নতির কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। ভগ্ন পাত্র, অঙ্কিত এবং খোদিত অস্থি ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যাহা কিছু পুরাতন নিদর্শন দৃষ্ট হয় তাহা মনুষ্য জন্মিবার অনেক কাল পরে পাওয়া গিয়াছে। বৃটনীয়েরা যে সময় নিতান্ত অসভ্য বনমানুষের ন্যায় ছিল, মৃত্তিকার কুটীরে বাস করিয়া পশুমাংস এবং ফল মূল আহার করিত, সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিত, এবং সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষাদিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত সেই সময়ের পূর্ব্বেও তোমাদিগকে যাইতে হইবে।

এখন তোমরা এ সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া যাও, তাহার পর যখন বস্তুবিচার গ্রন্থের পরিবর্ত্তে পাহাড় ও শীলা হইতে জ্ঞান শিক্ষা করিবে, তখন বুঝিতে পারিবে এই পৃথিবী কত

কালের পুরাতন এবং কিরূপ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু ইহা যদিও অনেক দিনের পুরাতন, তত্রাপি উজ্জ্বলতা এবং সৌন্দর্য্যে চিরনূতনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য কত দিন অবধি এখানে বাস করিতেছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু যে মঙ্গলময় পরমজ্ঞানী পুরুষের এই জগৎ তিনি উপযুক্ত সময়েই তাহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুরাকালের প্রকৃতাবস্থা জানিবার পক্ষে লিখিত ইতিহাস, অস্ফুট ভাষা কিম্বা কোন কোন পুরাতন কীর্ত্তি ইহাই একমাত্র উপায়। লিখিত ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় এবং অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু আদিমাবস্থার ইতিহাস সকল এত দূর ভ্রম কল্পনা ও রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করা অতিশয় কঠিন কার্য্য। লিখিত ইতিহাস সত্ত্বেও পুরাকালের যথার্থ বৃত্তান্ত স্থির করা যদি এত কঠিন হইল, তবে যে দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যে সময়ের বৃত্তান্ত জানিতে হইলে খোদিত প্রস্তর, অপরিস্ফুট ভাষা এবং প্রস্তর নির্ম্মিত কোন কোন স্মরণস্তম্ভ, অস্ত্র বা যন্ত্র অধ্যয়ন করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, তাহার যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করা যে এক প্রকার মনুষ্যের অসাধ্য কার্য্য সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তথাপি তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতদিগকে ধন্যবাদ যে তাঁহারা ভূগর্ভস্থ স্তর হইতে ঐ সকল পদার্থ অধ্যয়ন করিয়া তদ্দ্বারা মানবজাতির ক্রমোন্নতির বিবরণ আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন ভূস্তর সমূহের পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, পৃথিবীর গঠন কাল পাঁচভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগ নির্ম্মিত হইতে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছে তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে আমরা পঞ্চম কল্পে বাস করিতেছি। এই পঞ্চম কল্পের মধ্যে তৃতীয় কল্পটি আবার তিনটী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত। কোন কোন দেশে দ্বিতীয় কল্পের স্তরে বিহঙ্গের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় কল্পের প্রথম যুগ হইতে তৃতীয় অর্থাৎ শেষ যুগের ভিতরেই নানাবিধ পক্ষী এবং হস্তী বৃষ ঘোটক ও বানরের কঙ্কাল সকল দেখিতে পাওয়া যায়; তৎসঙ্গে মনুষ্যাস্থিও নয়নগোচর হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহার পূর্ব্বেও মনুষ্য জন্মিয়াছিল। সে যাহা হউক, চতুর্থ কল্পে মানবকীর্ত্তি এবং তাহার দেহাস্থির ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে মানব জাতির ইতিহাস আরম্ভ বলিতে হইবে। উপরিউক্ত নরকঙ্কাল এবং তদীয় হস্তরচিত বিবিধ পদার্থ সকল মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে মানব জাতির মানসিক উন্নতির ক্রমবিকাশ কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। এই কালের পুরাবৃত্তের বিস্তারিত বিবরণ সমস্ত সত্য হউক না হউক, স্থূল স্থূল বিষয়গুলি স্বাভাবিক এবং সত্য। উন্নতির এক সোপান হইতে অন্য সোপানে উঠিতে অনেক সময় লাগিয়াছে, সুতরাং মনুষ্যকৃত বিবিধ পদার্থ দ্বারা অনুমিত হয়, লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেও সে পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু পৃথিবীর আকার কালস্রোতে যেমন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, জীবজন্তু

উদ্ভিদ এবং মানবজাতি সম্বন্ধেও তেমনি যুগান্তর হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নরনারীর দেহকান্তি, এবং মানসিক উন্নতি সাধনের জন্য কত কত প্রাচীন মনুষ্যবংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু প্রত্যেক বংশই আমাদের জন্য জ্ঞান, ধন কিছু কিছু রাখিয়া গিয়াছেন। এখনকার নিতান্ত দরিদ্র আশ্রয়হীন ব্যক্তিরাও পৈতৃক ধনে ধনী। সুপণ্ডিত পুত্র পৌত্রের জন্য অনেক অজ্ঞান পিতা পিতামহের প্রয়োজন হইয়াছিল।

# জগতের বাল্য ইতিহাস।

## মনুষ্যের প্রথম অভাব।

মনুষ্য এই পৃথিবীতে প্রথমে যখন আগমন করিল তখন সে সম্পূর্ণ অসহায়, বিবস্ত্র, নিরাশ্রয় এবং সম্বলবিহীন; কোথায় কি আছে তাহা সে কিছুই জানিত না। বহুকাল পরে ক্রমে এই ধরাতলকে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে, এবং ভূগর্ভ খনন করিয়া আকর হইতে প্রয়োজনীয় ধাতব পদার্থ সকল উত্তোলন করিয়াছে। এক শারীরিক অভাব মোচন এবং সুখ বর্দ্ধনের জন্য সে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে বর্ত্তমান উন্নতির মঞ্চ গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। মানবমনে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ কি আশ্চর্য্য প্রবৃত্তিই প্রদান করিয়াছেন! তাহার উন্নতির জন্য আর কাহাকেও কিছু ভাবিতে হইল না, আপনিই সে ক্রমে ক্রমে আপনার সমস্ত আয়োজন করিয়া লইল।

প্রথমে কেবল শারীরিক অভাব মোচনার্থ মনুষ্যের মনে চিন্তাশক্তির উদ্রেক হয়। তদনন্তর আহারের জন্য খাদ্য, উত্তাপের জন্য অগ্নি, রাত্রিকালে বিশ্রামের জন্য এবং প্রতিবাসী বন্য জন্তুদিগের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। এই চিন্তা এবং এই ইচ্ছাটী মনুষ্যমনের প্রথম ক্রিয়া।

বিশ্বপালক ঈশ্বর পশুদিগকে যে কোন স্থানে স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তাহাদিগের জীবন ধারণের জন্য আহারের বস্তু সকল নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন, এবং শীতাতপ নিবারণার্থ তাহাদিগকে উপযুক্ত গাত্রাবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যসম্বন্ধে তিনি এরূপ সুবিধা করিয়া দেন নাই। পৃথিবীর যে অংশে মনুষ্য বাস করিবে তথাকার উপযোগী অন্ন বস্ত্র তাহাকে নিজেই অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে; এই জন্য তাহাকে তিনি বিবস্ত্র করিয়া এখানে পাঠাইলেন। পরমেশ্বর যদি তাহার শরীরকে লোমযুক্ত কোন স্থূল চর্ম্মে আবৃত করিয়া দিতেন তাহা হইলে সে স্বচ্ছন্দে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারিত না। এই নিমিত্ত তিনি তাহাকে উলঙ্গ করিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে তিনি এমন বুদ্ধিশক্তি এবং শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা সে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। পশুরা চিরকাল পশুই থাকিয়া যায়, তাহাদের আর কোন উন্নতি হয় না, কিন্তু মনুষ্য সেরূপ নহে, সে ক্রমাগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; পূর্ব্বপুরুষগণ যে যে বিষয়ে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহাকে আবার সে আরও উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

অতি দূরদর্শী খেচরের ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টিশক্তি যদিও তীক্ষ্ণ নহে, তথাপি এ প্রকার আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করিবার তাহার ক্ষমতা আছে যে, তাহা দ্বারা বহু দূরস্থিত নক্ষত্রদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় কেবল তাহা নহে, সূর্য্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে কি প্রকার পদার্থ

আছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। প্রবল বেগগামী হরিণের ন্যায় দৌড়িবার শক্তি কিম্বা ভীমবলধারী অশ্বের ন্যায় পরাক্রম যদিও তাহার নাই, কিন্তু সে বুদ্ধিবলে এবং জ্ঞানকৌশলে এমন সকল বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে যাহা এক ঘণ্টায় ত্রিশ ক্রোশ পথ চলিয়া যায় এবং শত অশ্বের কার্য্য সম্পাদন করে।

শারীরিক বা মানসিক যে কোন শক্তি মনুষ্যের আছে ব্যবহার দ্বারা তাহার উন্নতি হইয়া থাকে। অসভ্য মনুষ্য আহার আহরণার্থ পুনঃ পুনঃ শারীরিক শক্তি পরিচালনা করিয়া যেরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং দ্রুতগামী হয়, জ্ঞানী সভ্য ব্যক্তি মানসিক শক্তি পরিচালনা দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন সম্বন্ধে সেই রূপ তাহাকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যান।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে খাদ্য সামগ্রী, উত্তাপ এবং বাসস্থান এই তিনটী বিষয়ে মনুষ্যের প্রথম অভাব বোধ হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যের পদার্পণ হইবার পূর্ব্বে পর্ব্বত-গাত্র হইতে নির্ম্মল জলস্রোতঃ অবিশ্রান্ত বেগে প্রবাহিত হইত, সুতরাং তাঁহাকে এথামে আসিয়া পিপাসা নিবারণের জন্য আর কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। এই জন্য তিনি প্রথমে জলস্রোতের নিকট বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু সকল এরূপ সহজে লব্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ক্ষুধা শান্তির জন্য তিনি প্রথমে বন্যফল ভোজন করিতে লাগিলেন। পান ভোজ-নেরত এইরূপ ব্যবস্থা হইল, তাহার পর এখন রাত্রিতে থাকেন কোথায়? দূরে বা নিকটে গ্রাম বা বসতি নাই,

চারি দিক্ অরণ্যময়। প্রকৃতি দেবী আপন ক্ষমতানুসারে নবাগত অতিথিকে পান ভোজন করাইয়া রাত্রিবাসের জন্য তাঁহাকে শৈলকন্দর এবং বৃক্ষের তল দেখাইয়া দিলেন। ক্রমে এক একটী করিয়া যে পরিমাণে তাঁহার অভাব বিকসিত হইতে লাগিল সেই পরিমাণে তিনি সাধ্যমত দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে লাগিলেন। স্বয়ং ভগবান্ যেন প্রকৃতির বেশে আদিম মনুষ্যসন্তানের জন্য প্রসূতী এবং ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রকৃতিই প্রথম মানবের পিতা মাতা শিক্ষক সহায় এবং পথপ্রদর্শক। জলস্রোতের সঙ্গে মৎস্যগণ ভাসিয়া যাইতেছে, নিকট দিয়া ক্রীড়াশীল হরিণের দল লম্ফ ঝম্প করিতে করিতে ঘোর বিপিনমধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার মৎস্য মাংস ভোজনের ইচ্ছা যে উত্তেজিত হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু হইলে কি হইবে? কোন প্রকার যন্ত্র বা অস্ত্র ব্যতীত সে ইচ্ছাত চরিতার্থ হইতে পারে না।

ইহা সত্য যে, ভূমণ্ডলে এরূপ কার্য্য অতি অল্পই আছে যাহা মনুষ্যের হস্ত দ্বারা সম্পন্ন না হইতে পারে, কিন্তু কোন যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। কেবল হস্তের দ্বারা বৃক্ষ ছেদন বা পশু বধ করা যায় না, লেখনী না হইলে লেখার কার্য্য চলে না, এই জন্য ছুরি কিম্বা অন্য কোন অস্ত্রাদির প্রয়োজন হয়। এই রূপ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য অস্ত্রাদির আবশ্যকতা সর্ব্বপ্রথমেই বোধ হইয়াছিল।

# প্রথম ব্যবহার্য্য যন্ত্র বা অস্ত্র।

মনুষ্যের অন্যান্য অভাবের মধ্যে প্রথমে বস্তু বিশেষ ছেদনার্থ কোন প্রকার সুতীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের প্রয়োজন হয়। যদিও ধাতব পদার্থ সকল পৃথিবীর অল্প নিম্নেই ছিল, কিন্তু তিনি তখন ইহার কিছু মাত্র সন্ধান জানিতেন না; সুতরাং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কোন রূপে কার্য্যোদ্ধার করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত অস্থি ও কাষ্ঠখণ্ড এবং পশুশৃঙ্গ দ্বারা যন্ত্রের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। চকমকির পাথর প্রথমাবস্থায় এ কার্য্যের বিশেষ উপযোগী ছিল, এবং তাহাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কারণ, এই প্রস্তরের উপর বলের সহিত আঘাত করিলেই আপনাপনি তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া একটা দিক্ ঠিক ছুরির পাতার ন্যায় হইয়া উঠিত। এই রূপ প্রবল ও দুর্ব্বল আঘাত এবং ঘর্ষণ দ্বারা কোনটী তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র, কোনটা মুদ্গর, কোনটা অন্যরূপ আকার ধারণ করিত। তাহাদের মধ্যে কোনটা ছয় ইঞ্চ দীর্ঘ তিন ইঞ্চ প্রস্থ ছিল, কোন কোনটা ইহা অপেক্ষাও বড় হইত। তখনকার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে। সেই প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরাতন কদাকার যন্ত্র সকল প্রধানতঃ জলস্রোতে নীয়মান বালুকামিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও কর্দ্দমরাশির নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রস্তরের অস্ত্র বর্ত্তমান যাবতীয় অস্ত্র বা যন্ত্রাদির জনক স্বরূপ মানিতে

হইবে। ভূস্তরে প্রস্তর নির্ম্মিত এমন কুঠার পাওয়া গিয়াছে যদ্দারা এখনও বৃক্ষাদি ছেদন করা যায়। ছুরি বর্শা তীরের ফলা গদা শূল সমস্তই প্রথমে পাথরের ছিল। ইহা ভিন্ন ধনুর্ব্বাণ ফিঙ্গা ব্যবহৃত হইত।

তৎকালে পৃথিবীতে যে সকল প্রকাণ্ড বন্যজন্তু মনুষ্যের প্রতিবাসী এবং অংশভাগী ছিল তাহাদিগকে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেকানেক প্রাচীন উদ্ভিদ্ জাতিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা ভূস্তরে ঐ সকল জন্তুর প্রকাণ্ড অস্থিময় দেহ সকল দর্শন করিয়া এই রূপ বলেন, যে সে সময় অতি প্রাচীন এবং বলবান্ লোমশ হস্তী, সিন্ধুঘোটক, গণ্ডার, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি বহু প্রকার জন্তু ছিল। ইউরোপ, আমেরিকা এবং আসিয়া খণ্ডের স্থানে স্থানে পৃথিবীর নিম্ন স্তরে হস্তী অপেক্ষাও প্রকাণ্ড এক প্রকার জন্তুর দেহাবশিষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কালের পরিবর্ত্তনে এবং স্বভাবের নিয়মে তাহা এখন পাষাণের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, তাহাদের দেহ নয় ফিট চারি ইঞ্চ উচ্চ, ষোল ফিট চারি ইঞ্চ দীর্ঘ, এবং শুঁড় নয় ফিট লম্বা ছিল। ইহারা যে মনুষ্যের সমকালবর্ত্তী তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; কেন না যে স্তরে মনুষ্যাস্থি এবং তাহার হস্তনির্ম্মিত যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তৎপার্শ্বেই ঐ সকল জন্তুদিগের দেহাস্থি অবস্থিতি করিতেছে।

বৎসরের পর বৎসর যেমন চলিয়া যাইতে লাগিল তেমনি যন্ত্র এবং অস্ত্রাদি সকল উৎকৃষ্ট আকার ধারণ

করিল। ক্রমে অপেক্ষাকৃত সুন্দর সুদৃশ্য বর্শা ছোরা কুঠার হাতুড়ি ইত্যাদি বিবিধ প্রকার যন্ত্র এবং অস্ত্রাদি মসৃণ প্রস্তরে পরিষ্কৃতরূপে প্রস্তুত হইল। এই রূপে প্রথম যুগে প্রস্তর ভাঙ্গিয়া তাহাকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া ঘা দিয়া ঘা দিয়া ছেলেদের খেলনার মত এক প্রকার কদাকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করা হয়, পর যুগে ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে কিঞ্চিৎ সুন্দর এবং সুশ্রী করা হইয়াছে।

পৃথিবীতে জীব জন্তু জন্মিবার পূর্ব্বে জলপ্লাবন দ্বারা যে সকল স্থান গহ্বরের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল প্রধানতঃ সেই সেই স্থানে এবং শৈল কন্দরে তখনকার ঐ সকল পরিষ্কৃত সুদৃশ্য অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত কন্দর বা গহ্বরে যে কেবল মনুষ্য বাস করিত এমন নহে, তন্মধ্যে মৃত দেহের সমাধিও হইত। সমাধি স্থানে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড প্রোথিত থাকিত। এমন সকল নিদর্শন আছে, যাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সেখানে আহারাদিও হইত। মৃত ব্যক্তিকে বহু দূরদেশ অতিক্রম করিয়া অন্য এক রাজ্যে যাইতে হইবে এই মনে করিয়া তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃত দেহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য সামগ্রী এবং যুদ্ধসজ্জা ও অস্ত্রাদি প্রদান করিত। মনুষ্যের অস্থি অপেক্ষা তাহার হস্তের কোন কোন কার্য্য যে অধিক কাল স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব হইতে মৃতদেহ দগ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই জন্য তাহা সচরাচর অধিক দৃষ্ট হয় না। আর অস্থি অপেক্ষা প্রস্তরের যন্ত্রাদি

বস্তুতঃও বহুদিন স্থায়ী। এই সকল যন্ত্রাদির উৎপত্তির আদি বৃত্তান্ত আমাদের বুদ্ধি মনের অগোচর। প্রথম মনুষ্যের জন্ম এবং জীবন ধারণ প্রণালী যেমন আমরা জানিতে পারি না, তেমনি প্রথম ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদির তত্বও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। প্রত্যেক কার্য্যের কারণই এইরূপ আমাদের অজ্ঞাতে অবস্থিতি করে। কার্য্যফল দেখিলে তবে কারণ অনুভব করা যায়।

প্রস্তরের অস্ত্র ও যন্ত্রাদি সঙ্গঠন করিয়া তাহা দ্বারা মনুষ্য যে কেবল আপনাকে এবং আপন পরিবারকে বন্য জন্তুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল তাহা নহে; পরিবর্দ্ধিত ক্ষুধানল নির্ব্বাণের জন্য তাহার সাহায্যে বড় বড় পশুদিগের প্রাণবধ করিয়া মাংস সংগ্রহ করিতেও সক্ষম হইল। ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয় যে প্রথমে মনুষ্যদিগকে এই প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্রাদির সাহায্যে কত কার্য্যই না সম্পন্ন করিতে হইয়াছে! তাহারা পশু বধ করিয়া তাহার মাংস খাইত, চামড়া পরিত, এবং চুয়ালের হাড় লইয়া কঠিন অস্ত্র প্রস্তুত করিত। জলের উপরিভাগে কাষ্ঠ ভাসে, ইহা দেখিয়া এই নূতন অস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করত অগ্নির সাহায্যে তাহাকে ক্ষুদ্র তরণী বা ডোঙ্গার ন্যায় সঙ্গঠন করিয়াছিল। সেই অস্ত্রই তখন তাহাদের এক মাত্র সম্বল। ইহা দ্বারা তাহারা ভোজ্য বস্তু কর্ত্তন করিত, অস্থির মধ্য হইতে মজ্জা বাহির করিয়া খাইত, সমুদ্রজাত শামুক গুগ্‌লি ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিত এবং অন্যান্য নানাবিধ কার্য্য সাধন করিত। এইরূপ অস্ত্র

এবং যন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদিমকালের কোন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার স্মরণচিহ্নস্বরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত বিবিধ আকারের পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। তখন অতি সহজেই প্রস্তরের স্মরণস্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইত। মৃত ব্যক্তির পদমর্য্যাদানুসারে সমাধি মন্দিরের গঠনপ্রণালীও বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা যেমন বড় লোকদিগের বীরত্ব মহত্ব ইত্যাদি গুণ স্মরণে রাখিবার জন্য তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি, তাহারাও তেমনি কোন আশ্চর্য্য কিম্বা গুরুতর ঘটনার চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি পাথর একত্রিত করিয়া রাখিত এবং উপাসনা মন্দিরের জন্য কতকগুলি পাথর বৃত্তের আকারে মাটিতে পুঁতিয়া তাহার মধ্যে পূজা অর্চ্চনা করিত। চেরাপুঞ্জি পর্ব্বতে ইহার নিদর্শন অদ্যাপি নয়নগোচর হয়।

যৎকালে প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্র দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইত তখন মনুষ্য অতি দরিদ্র, গৃহহীন দুঃখী ছিল। তাহারা ফল মূল আম মাংস, সময়ে সময়ে নরমাংসও ভক্ষণ করিত। কোন কোন জাতি মদ্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। অসভ্যগণ পশুর ন্যায় যেখানে থাকিত সেই খানেই মল মূত্রত্যাগ করিত, মর্কটের ন্যায় কথা কহিত, শ্বাপদদিগের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া মাংস খাইত। অবশ্য এ সকল আলোচনা করিয়া আমাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কেননা, কেবল আর্য্যসন্তান সন্তান বলিলে সত্য কথা বলা হয় না, আদিম অসভ্যগণ আমাদের পিতা পিতামহ ছিলেন গৌরবের সহিত তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে

যাহারা একটু সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা পশুচর্ম্ম পরিধান করিত। অস্থি এবং তন্তুকে সূঁচ এবং সূতা করিয়া তাহা দ্বারা সেই চর্ম্মবস্ত্র সেলাই করা হইত। বস্ত্রও যেমন সূক্ষ্ম ছিল সেলাই করিবার সূচ সূতাও তেমনি!

প্রথম হইতেই মনুষ্যমনে মৎস্য মাংস ভোজনেচ্ছা বলবতী হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া লোকে আহার আহরণার্থ বিবিধ বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিয়াছে। পশু বধের জন্য তাহারা পথের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার উপর পাতা ঢাকা দিয়া রাখিত, এবং পশুগণ হঠাৎ তন্মধ্যে পতিত হইলে অমনি প্রস্তরাঘাতে তাহাদিগকে বধ করিত। মৎস্য ধরিবার জন্য জাল বড়শি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত পশু হননের অনেক প্রকার কৌশল তাহারা জানিত। এখনও অসভ্য জাতিরা পশু পক্ষীর মত শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা শুনিয়া যাই তাহারা নিকটে আসে, অমনি পাথর ছুড়িয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। মনুষ্য জাতি যখন যে অবস্থায় যেখানে থাকে তদুপযোগী তাহার বুদ্ধি ক্ষমতা সকলও আপনা আপনি বিকসিত হয়। বাহ্য অবস্থা এবং আন্তরিক অভাব দুইটীতে সংগ্রাম করিতে করিতে পরিণামে বিবিধ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা এখন লিখিতেছি, তখন কালকে প্রভেদ করিবার পক্ষে দিন রাত্রি এবং চন্দ্র সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। শতাব্দী বর্ষ মাস সপ্তাহ বার তিথি এবং ভূভাগের নামকরণ অনুষ্ঠান তখন হয় নাই। যদিও কিছু হইয়া থাকে তাহার সংবাদ সভ্য জগতে পৌছে

নাই। সুতরাং আমরা সময় নির্দ্দেশের জন্য প্রস্তরযুগ, পিত্তলযুগ, লৌহযুগ, এই তিনযুগে উহা বিভাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

---

## অগ্নিউৎপাদন।

প্রথমে অগ্নিউৎপাদন কি রূপে হইল তৎসম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু মনুষ্য এক বুদ্ধিবলেই সকল অনাবিষ্কৃত বিষয় ক্রমে আবিষ্কার করিয়াছে। এক দিকে তাহার সহজ জ্ঞানচক্ষু যেমন দিন দিন সমুজ্জ্বল হইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনি অভাব এবং স্বভাব আপনা হইতেই জীবন ধারণের উপযোগী বস্তু সকলের নিকট তাহাকে লইয়া চলিল। দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের পরস্পর সংঘর্ষণ দ্বারা অগ্নিউৎপাদন করা যায় সহজজ্ঞান ইহা শিখাইয়া দিয়াছে। যখন চকমকির পাথর ভাঙ্গিয়া অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইত তখন অগ্নিকণা সকল তাহার মধ্যে দেখা গিয়াছিল। যখন শরীর অত্যন্ত শীতল বোধ হইত, তখন তাহারা হস্তে হস্ত ঘর্ষণ করিয়া উত্তাপ বাহির করিত। কখন এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠশলাকা অপর এক খণ্ড কাষ্ঠের উপর সবলে এমন টান দিত যে তাহাতে দাগ বসিয়া উভয়েই কিছু কিছু উত্তপ্ত হইত, পুনরায় সেই দাগের উপর টান দিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উড়িত, তৃতীয় বার টানিলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত। আর্য্য ঋষিগণ কাষ্ঠ ঘর্ষণ দ্বারা পবিত্র অগ্নি উৎপাদন করিয়া যজ্ঞাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন।

ভ্রমণকারিগণ বলেন অসভ্য জাতিরা এই রূপে অতি অল্প ক্ষণের মধ্যে আগুন জ্বালিতে পারে। ইউরোপের উত্তর সমুদ্রস্থ দ্বীপে এক প্রকার চর্ব্বিযুক্ত পক্ষী পাওয়া যায় তাহাদের দেহ অগ্নি সংযোগে বাতির ন্যায় জ্বলিতে থাকে। অসভ্য দ্বীপবাসীরা ইহা দ্বারা আলোকের কার্য্য সম্পন্ন করে। পর্ব্বতে জঙ্গলে এক প্রকার তৈলাক্ত কাষ্ঠ আছে তাহা মশালের মত জ্বলে। মনুষ্যের পক্ষে অগ্নি একটী বিশেষ উপকারী বস্তু। হিংস্রক পশুদিগের করাল গ্রাস হইতে বাঁচিবার পক্ষে অগ্নি একটী বিশেষ সহায়। এই নিমিত্তে যে সকল লোক পাহাড় বা জঙ্গলে বাস করে তাহারা সর্ব্বদা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া রাখে। পথিকেরা দুর্গম অরণ্যপথে আগুন জ্বালিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। এই অগ্নি সর্ব্বস্থানে প্রকাশ্য অথবা প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু ইহা বাস্তবিক কি পদার্থ তাহা জ্ঞানচক্ষে অদ্যাপি প্রতিভাত হয় নাই, কেবল কার্য্য মাত্র দৃষ্টি গোচর হয়। এই অগ্নি সকল বস্তুকে পোষণ করিতেছে।

---

## রন্ধন এবং রন্ধনপাত্র।

প্রথমে মনুষ্যগণ অপক্ক ফলমূল এবং কাঁচা মাংস আহার করিত, রন্ধন করিতে জানিত না; রাঁধিবার পাত্র এবং দ্রব্যাদি মসলা কিছুই ছিল না, থাকিলেও কোন্ বস্তুর কি গুণ তখন তাহা কাহার বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই।

পশুপালন এবং কৃষিকার্য্যের পূর্ব্বে রন্ধনপাত্র এবং অন্যান্য পাত্র গঠিত হইয়াছিল। চাউল, দাউল লবণ তৈল ঘৃত ময়দা প্রভৃতি রন্ধন সামগ্রী তখন কোথায় যে তাহারা ভাত রাঁধিয়া বা লুচি ভাজিয়া খাইবে? তখন হস্তের নিকট যাহা কিছু ছিল তাহা দ্বারাই প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছে। আমরা এখন যে সকল অন্ন ব্যঞ্জন এবং উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছি এ সকল আবিষ্কৃত হইতে অনেকের জীবন পাত হইয়াছে এবং ইহার জন্য অনেকে অনেক বুদ্ধি এবং পরিশ্রম ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে যেমন ক্রমে উন্নতি হইয়াছে, তেমনি ক্রমশঃ লোকে নানা প্রকার সুখসেব্য সামগ্রী রাঁধিতে শিখিয়াছে। যখন রন্ধনপাত্র প্রস্তুত হয় নাই, তখন কাঁচা মাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভোজন করা রীতি প্রচলিত ছিল। কিছু দিনান্তে আদিম মনুষ্যগণ মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার উপর মৃত পশুদেহের পশ্চাদ্ভাগের এক খণ্ড বৃহৎ অস্থি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে জল ঢালিয়া মাংস ছাড়িয়া দিত, পরে এক খান পাথর উত্তপ্ত করিয়া সেই পাত্রের মধ্যে ফেলিয়া দিত। যে পর্য্যন্ত জল উত্তপ্ত এবং মাংস সিদ্ধ না হইত ততক্ষণ তাহারা এই রূপ করিত। কিছু দিন পরে এ বিষয়ে একটু উন্নতি হইলে উক্ত অস্থিময় পাত্রের নিম্নভাগে মৃত্তিকা লেপন করিয়া তাহা অগ্নির উপর রাখিয়া আহার্য্য বস্তু সিদ্ধ করিতে লাগিল। শুষ্ক অস্থি অগ্নির উপর রাখিলে যে তাহা দগ্ধ হইয়া যাইবে এত টুকু বুদ্ধি তখন জন্মিয়াছে। অগ্নি সংযোগে মৃত্তিকা কর্দ্দম কিরূপ শক্ত হইতে পারে ইহা দ্বারা

তাহাও ক্রমে জানা গেল। তদনন্তর ক্রমে তাহারা অস্থি ছাড়িয়া কেবল মৃত্তিকার পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া অগ্নি বা সূর্য্যের উত্তাপে তাহাকে শুকাইয়া রন্ধন পাত্রের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। গারো নামক অসভ্য জাতিরা বাঁশের চোঙ্গায় মাটি মাখাইয়া তাহাকে আগুনে বসাইয়া রন্ধন-কার্য্য সমাধা করে।

## বাসস্থান।

ভূগর্ভে এবং শৈল গহ্বরে প্রথমে কিছু দিন বাস করিয়া পরে মনুষ্যগণ মৃত্তিকার ভিত্তির উপর বৃক্ষশাখা স্থাপন-পূর্ব্বক তাহার নিম্নে বাস করিতে লাগিল। কেহ বা পর্ব্বত স্খলিত শৈল খণ্ড একত্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিত। সুইজার্লণ্ডের অন্তর্গত সুইস প্রভৃতি কোন কোন হ্রদের মধ্যে এইরূপ গৃহের অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। জলের উপরিভাগে কাষ্ঠের ভেলা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ঐ সকল কুটীর নির্ম্মিত হইত। উক্ত ভেলার আকার দেখিলে বোধ হয় তখনকার লোকেরা পাথরের বাটালি দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিয়া ভেলা বাঁধিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জলের উপর বাস করিত। শত্রু ও বন্যজন্তুদি-গের আক্রমণ হইতে বাঁচিবার পক্ষে এ রূপ বাসস্থান বোধ হয় কিছু সুবিধাজনক ছিল। আদিম আমেরিকাবাসী ও অন্যান্য অসভ্য মনুষ্যগণ অনেকে এখনও এই রূপ গৃহে বাস করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সকল হ্রদবাসী মনুষ্যগণ

প্রস্তর নির্ম্মিত বাটালি দ্বারা বৃক্ষ ছেদন, পশুহনন প্রভৃতি অনেক কার্য্য নিষ্পন্ন করিত। এক প্রকার বৃক্ষের ছাল হইতে সূতা বাহির করিয়া জাল বুনিয়া তাহা দ্বারা তাহারা মৎস্য ধরিত। যে সকল শামুক গুগলি ঝিনুক জালে ধরা পড়িত তাহাদিগের রাশীকৃত খোলা স্তূপাকার করিয়া তাহার উপরেও অনেকে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিত। ডেনমার্ক এবং স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি দেশে সমুদ্রউপকূলে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেখানে ভক্ষিত পশুর অস্থি এবং পাথরের অস্ত্রাদিও নয়ন গোচর হইয়াছে।

মনুষ্যের যে তিনটী অভাবের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই রূপে পূর্ণ হইল। তখন কি রূপে তাহারা পরস্পরের সহিত কথা বার্ত্তা কহিত এবং এক জন অপরকে কি বলিয়াইবা ডাকিত তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়; কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহা নিশ্চয়, যে কোন না কোন উপায়ে তাহারা মনোগত ভাব পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিতে পারিত, পরে সমাজবদ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু করিয়া লেখা পড়া ও গণিত শিক্ষা করিয়াছে। তাহারা ছবিও আঁকিতে জানিত, তাহার প্রমাণ এই যে স্লেটের উপর সামান্য রূপে অঙ্কিত কোন কোন বন্য জন্তুর প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। পশু অপেক্ষা যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ তাহা পুরাতন পৃথিবী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছে। কোন বন্যজন্তু এরূপে কখন লিখিতে বা ছবি আঁকিতে কিম্বা অগ্নি জ্বালিতে পারে নাই।

# ধাতু ব্যবহার।

মনুষ্য সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং অভাব পূরণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীগর্ভে বিবিধ রত্নরাজি সঞ্চিত ছিল। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কিছু জ্ঞানী হইলেন তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও মস্তিষ্ক পরিচালনা দ্বারা ক্রমে সে সকল অধিকার করিতে লাগিলেন। মানব জাতির শৈশবাবস্থাতেই বুদ্ধির প্রতিভাশক্তি পরিলক্ষিত হইয়াছে। যে সময় সমস্তই অভাব ছিল, কেহ কাহাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিত না, তৎকালে যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন এক্ষণে আর তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ এখন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে মস্তিষ্ক পরিচালনের প্রায় প্রয়োজন হয় না। একখানি পাঠ্য পুস্তকের পাঁচ খানি অর্থ পুস্তক পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই,বহু পূর্ব্ব-কালের প্রচলিত কার্য্য কৌশল এখনও অনেকে অবলম্বন করিয়া থাকে। পুরাতন লোকদিগের এই জন্য এত সম্মান। ধাতুর কার্য্যকারিতা, মানব জীবনের সহিত তাহাদের নিকট সম্বন্ধ যখন আমরা আলোচনা করি, যখন ভাবি যে এ সকল আবিষ্কৃত না হইলে দ্রুতগামী অর্ণবপোত, বাষ্পীয় শকট এবং অপরাপর ব্যবহার্য্য সামগ্রী কিছুই প্রস্তুত হইত না, তখন আমাদের মন কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হয়। যদি খনিজ পদার্থ সকল আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে মনুষ্যের এত দূর উন্নতি আমরা কখনই দেখিতে পাইতাম না;

ইহার অভাবে চিরদিন সকলকে অতি অসভ্য দরিদ্রাবস্থায় থাকিতে হইত সন্দেহ নাই।

যখন প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্র সকল অভাবোপযোগী দ্রব্যাদি সঙ্গঠনে অপারক হইল, মনুষ্যের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সাধন করিবার পক্ষে যখন তাহা নিতান্ত নরম এবং ভোঁতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তখন ধাতব পদার্থের বিশেষ আবশ্যকতা বোধ হইয়াছিল। কিন্তু ভূগর্ভস্থ রত্নভাণ্ডারে কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। যখন যে বস্তুটির অভাব বোধ হইয়াছে মনুষ্য তখনই তাহা পাইয়াছে; কখন তাহাকে সে জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতে হয় নাই। পাথরের দ্বারা যখন আর কার্য্য চলিল না তখন বসুন্ধরা আপনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বহু মূল্য সামগ্রী তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। যখন ইন্ধনের অল্পতা হইতে লাগিল তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়লার খনি সকল বাহির হইয়া পড়িল।

প্রথমে স্বর্ণের উপর লোকের দৃষ্টি পতিত হয়, এবং বিলক্ষণ সম্ভব যে ইহাই সর্ব্বাগ্রে মনুষ্য কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। কেন না স্বর্ণের উজ্জ্বলতা স্বভাবতঃ আপনা হইতেই নয়নকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত আরও কারণ এই যে নদীস্রোতে, পৃথিবীর উপরিভাগে এবং প্রস্তরের গাত্রে সহজেই স্বর্ণ খণ্ড সকল দৃষ্টিগোচর হইত। এই স্বর্ণ সভ্য অসভ্য সকলেরই পরম প্রার্থনীয় পদার্থ। সে সময়ের লোকের পরিধান অপেক্ষা আভরণের প্রতি অধিক অনুরাগ ছিল। প্রথম হইতেই তাহারা শামুক ঝিনুক ইত্যাদির শঙ্খে অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া গলায় দিত। উদ্ভিদ পরিবার তাহাদের বড়

সাধ ছিল, সাধারণতঃ সকলেই প্রায় সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিত। এখনও যে সকল দেশ সুরুচি সম্বন্ধে নিতান্ত অসভ্য কিম্বা যে দেশের লোকেরা পূর্ব্ব প্রথার একান্ত পক্ষপাতী তাহাদের মধ্যে উল্কি পরিবার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, শরীরে রক্তপাত করিয়াও আদিমাবস্থার মনুষ্যেরা দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। অনেকে রং ফলাইতে জানিত। মাকড়ি, মল, কণ্ঠমালা, কাষ্ঠের চিরুণিরও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ হওয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক, পশুদের মধ্যে এ প্রকার কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। কোন গাভি আহার পরিত্যাগ করিয়া কখন সূর্য্যাস্ত দর্শন করে না, এবং কোন অশ্ব কিম্বা হনূমান রামধনু দেখিয়া যে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছে ইহাও আমরা শুনি নাই।

স্বর্ণের ন্যায় তাম্রও বহু অগ্রে মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় এই তাম্রের দ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। স্বর্ণের ন্যায় তাম্র অমিশ্র এবং নরম ধাতু. সুতরাং তাহা বিবিধ আকারে পরিণত হইতে পারে। যেখানে তাম্র অধিক পাওয়া যাইত না, সেখানে লোকে দস্তার সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া উভয়ের যোগে পিতল প্রস্তুত করিত। সেই পিতলকে অগ্নিতে গলাইয়া বালুকা বা প্রস্তরের ছাঁচে ঢালিয়া তাহারা ইচ্ছানুরূপ নানাবিধ যন্ত্র ও অস্ত্রাদি সঙ্গঠন করিয়াছিল।

অনেক দিন পরে লৌহখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; এমন

কি সভ্যতার অতি অল্প কাল পূর্ব্বে ইহা মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়াছে। কারণ আকর এবং প্রস্তরের ভিতর হইতে লৌহ বাহির করিতে কিছু অধিক বুদ্ধি কৌশলের প্রয়োজন হইয়াছিল। যখন লৌহ দ্বারা সকল অস্ত্র ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল তখন পিতলের দ্বারা অলঙ্কার ও অন্যান্য কার্য্য হইতে লাগিল। সুইস হ্রদে সেই সকল অলঙ্কারের কোন কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের পর রূপা এবং সীসার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নদীগর্ভে, মৃত্তিকাগহ্বরে, পর্ব্বতকন্দরে মনুষ্যকৃত এই সমস্ত অস্ত্র, যন্ত্র, গহনা ইত্যাদির নিদর্শন দেখিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক কালের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মনুষ্যোন্নতির ইতিহাসের প্রথম ভাগ তিন যুগে বিভক্ত। প্রথম যুগে প্রস্তর, দ্বিতীয় যুগে পিত্তল, তৃতীয় যুগে লৌহ। পর্য্যায়ক্রমে এই তিন পদার্থ দ্বারা ব্যবহার্য্য বস্তু ও যন্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। লণ্ডন নগরে "ব্রিটিশ মিউজিয়ম" নামক বিচিত্র ভবনে পুরাকালের ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত ঐ সকল দ্রব্য অনেক একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজ এবং বুন্দেলখণ্ডের কোন কোন স্থানে প্রথম যুগের পাথরের যন্ত্রাদি অনেক বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য অনেক স্থানে পুরাতন মনুষ্যদিগের হস্তনির্ম্মিত বহুল দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চিম ইউরোপের স্থানে স্থানে ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূস্তর হইতে এইরূপ অনেক নিদর্শন পাইয়াছেন। পাথরের অস্ত্রের কত দিন পরে পিত্তল নির্ম্মিত অস্ত্র ও যন্ত্রাদি ছাঁচে সঙ্গঠিত হইয়াছে

তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, পিতল এবং লৌহের কার্য্যকারিতা অবগত হইবার পূর্ব্বে প্রস্তর ব্যবহৃত হইত; এবং একই সময়ে যখন কোন এক জাতি প্রস্তরযুগে বাস করিত, তখন অপর কোন জাতি ধাতুর মর্য্যাদা বুঝিয়াছিল। অতএব উক্ত তিন যুগ পৃথিবীতে সমকালবর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করিয়াছে। রামধনু যেমন তিনটী প্রধান বর্ণে মিশ্রিত, মনুষ্যজাতির বাল্যইতিহাসও তেমনি উপরিউক্ত যুগত্রয়ে সম্মিলিত। পূর্ব্বোল্লিখিত হ্রদে যে সকল বাসগৃহ ছিল তাহার কতক অংশ যদিও প্রথম যুগের, কিন্তু অধিকাংশ দ্বিতীয় যুগের লোকের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত গৃহের পুরাতন চিহ্ন দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, মনুষ্যসমাজ কেমন ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে। হ্রদবাসী মনুষ্যগণ গোধূমের চাস করিয়া শীতকালের জন্য শস্যাগারে তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিত, এবং গাছের ছালের সূতা বাহির করিয়া বস্ত্র বয়ন করিত, ও ছাগ মেষ অশ্ব প্রভৃতি পরমোপকারী জন্তুদিগকে প্রতিপালন করিত। কুকুর বহু পূর্ব্বকাল হইতেই লোকের নিকট আদৃত হইয়াছে। অতি অসভ্য জাতিরাও কুকুরদিগকে ভালবাসিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃগয়ালব্ধ যে সকল বন্য জন্তুকে তাহারা গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিত তাহারাই ক্রমে গৃহপালিত পশু হইয়াছে। যে সকল পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা মানবের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন তাহা এইরূপে অল্পে অল্পে অরণ্য হইতে লোকালয়ে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু কতকগুলি পশু এবং বৃক্ষ লতা চিরকাল অরণ্যেই থাকিয়া

গেল। কতকগুলি মনুষ্যও অদ্যাপি বন্য অসভ্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে।

লৌহযুগের উন্নতি কিছু শীঘ্র শীঘ্র হইয়াছিল। নানাবিধ মৃন্ময় পাত্র প্রস্তুত করা, পিত্তলের মুদ্রা ছাঁচে ঢালা, কাচ আবিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়,মনুষ্য কেমন অধমাবস্থা হইতে উন্নতির অবস্থায় উত্থিত হইয়াছে।

---

## মানবসমাজের উন্নতির সময়।

এ স্থলে এ রূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, উপরউল্লিখিত পুরাতন চিহ্ন সকল যে বহু পুরাকালের তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম ? যে সকল স্থানে পুরাতন অস্থি এবং অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল স্থানের বর্ণনা করিলেই ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইবে।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডিভন্সায়ারের দক্ষিণ উপকূলে ব্রিক্স্যাম্ নামক স্থানে এক প্রকাণ্ড গহ্বর ছিল। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল সহসা উক্ত গহ্বরের ছাদ ভগ্ন হইয়া উহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। ছাদের মধ্য দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পতিত হওয়াতে তাহার নিম্নভূমি ক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া যায়। অনুমান তাহার এক ফুট ভূমি নিম্নে বন্য হরিণ এবং ভল্লুকের অস্থি, তাহার নিম্নে প্রায় পনের ফিট পরিমাণে রক্তবর্ণ কর্দ্দমরাশি, তাহার মধ্যে প্রস্তরের ছুরি, ম্যামথ ( বৃহৎ লোমশ হস্তী ) নামক প্রকাণ্ড পশুর

অস্থি প্রোথিত ছিল। ইহার নিম্নে বিংশতি ফিটের অধিক উচ্চ এক প্রকার প্রস্তর ও বালুকামিশ্রিত স্তরে প্রস্তরের ছুরি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি সকল পাওয়া গিয়াছে। এই গহ্বর-মধ্যে ত্রিশ খানির অধিক চকমকির পাথর এবং ভল্লুক ও লোমশহস্তীর কতকগুলি অস্থি সন্নিবিষ্ট ছিল। উক্ত প্রস্তর এবং অস্থি মনুষ্যহস্ত দ্বারা খোদিত, সুতরাং এই স্থানে যখন ঐ সকল পশু বিচরণ করিত, তখন তাহাদের সঙ্গে যে মনুষ্যও বাস করিত তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

পাঠকগণ আরও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই সকল পশুর অস্থি যে বহু পুরাতন তদ্বিষয়ে আমাদের কি প্রমাণ আছে? ইহার প্রমাণ এই, প্রথমতঃ বহু শতাব্দী হইতে সেরূপ প্রকাণ্ড দেহধারী জীবন্ত ম্যামথ (বৃহৎ লোমশ হস্তী) আর নয়নগোচর হয় না; দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অস্থি পৃথিবীর অতি গভীর স্থানে অবস্থিতি করে; অতএব যদি ইহা সত্য হয়, যে ততদূর নিম্নে কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সকল অস্থি পুঁতিয়া রাখে নাই, তাহা হইলে অবশ্যই ইহার অন্য কোন কারণ আছে স্বীকার করিতে হইবে।

নানাবিধ উপায়ে অস্থি সকল গহ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পশু হয়ত পর্ব্বতপার্শ্বে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের দেহাস্থি জলস্রোতে ভাসিয়া গহ্বরের মধ্যে নীত হইয়াছে। অথবা গহ্বরমধ্যে তাহারা আশ্রয় লইয়াছিল, কিম্বা সেই স্থানেই তাহারা বাস করিত। যে কারণেই হউক, ফলতঃ যে পঁয়ত্রিশ ফিট উচ্চ কর্দ্দম, বালুকা ও প্রস্তরমিশ্রিত স্তরের মধ্যে এ সমস্ত প্রাপ্ত

হওয়া যায় তাহার যথার্থ কারণ কি তাহা আমাদিগকে নিরূপণ করিতেই হইবে।

পৃথিবীতে জীব জন্তু জন্মিবার পূর্ব্বে এবং পরে যে মহা-শক্তি মহোচ্চ পর্ব্বতচূড়াকে গভীর গহ্বর, এবং অতল জলধিকে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে পরিণত করিয়াছে, এক স্থানের মৃত্তিকা অন্য স্থানে লইয়া গিয়া নূতন দেশ রচনা করিয়াছে, সেই জীবন্ত স্বভাবের প্রভাবেই ঐ সকল অস্থি খণ্ড বহুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। জলস্রোতে পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দম, বালুকা ও ক্ষুদ্র প্রস্তররাশি ব্রিক্স্যামের গহ্বরে আনীত হয় এবং তদ্দ্বারা অস্থি সকল আচ্ছাদিত হইয়া যায়। তৎকালে সে দেশে বল্গা হরিণ, ম্যামথ ইত্যাদি জন্তুর বাস ছিল, সুতরাং জলস্রোতে ইহাদের অস্থি চতুঃপার্শ্বস্থ পর্ব্বত গহ্বরমধ্যে একশত ফিট নিম্নে নিহিত হইয়া গিয়াছে। এ সমস্ত চিহ্ন দেখিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন যে অনেক সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্য দ্বারা প্রস্তরের অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র এইরূপে আমাদিগকে পৃথিবীর আদিম কালের বিষয় এবং জন্মরহিত অনাদি ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রিয়া বুঝাইয়া দিতেছে, সেই বিজ্ঞান শাস্ত্রই দিন দিন নূতন সৌন্দর্য্যের সহিত তাঁহার অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিতেছে। এই বিশাল বিশ্বমন্দির যে তাঁহার চিরবিহার স্থান, জ্যোতিঃশাস্ত্র তাহা বলিয়া দিতেছে। জ্ঞানী মূর্খ সকলের দ্বারাই তিনি আপনার শিল্পনৈপুণ্য, জ্ঞান বুদ্ধি ও মঙ্গল অভিপ্রায় জগতে প্রচার করিয়াছেন।

## পশুপালন ও কৃষি বাণিজ্য।

ফলমূলাহারী গিরিকন্দরবাসী বনচারী অসভ্য মনুষ্য কিছু কাল অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ক্রমে পশুপালক এবং কৃষক হইয়া উঠিল। ইহাতে যে কেবল মৃত্তিকার আশ্চর্য্য উৎপাদিকা শক্তি তাহার জ্ঞানগোচর হইল তাহা নহে, পশু পক্ষী অপেক্ষা সে নিজে যে মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ জীব তাহাও সে অনুভব করিতে লাগিল। কোন কোন চতুষ্পদ জন্তুর দুগ্ধে এবং মাংসে শরীর রক্ষা হয়, এবং তাহাদের নিজের এবং শাবকের চর্ম্মে অতি কোমল পরিধেয় বসন প্রস্তুত হয় ইহা অবগত হইয়া কতকগুলি লোক তাহাদিগকে যত্নে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে তৃণ পত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত সেই স্থানে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিয়া চরাইতে লাগিল। প্রথমে কিছুকাল এই রূপে ইহারা পশুপালক হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না, সঙ্গে শিবির থাকিত, যখন যেখানে যাইতে ইচ্ছা হইত শিবির উঠাইয়া তাহারা চলিয়া যাইত। আমাদের ও অন্যান্য দেশের বেদীয়ারা এখনও এই রূপে ভ্রমণ করিয়া জীবন কাটায়। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এব্রাহেম এই রূপে জীবন যাপন করিতেন। আরব ও অন্যান্য ভ্রমণকারী জাতিরা এখনও এই ভাবে কাল কর্ত্তন করে।

যখন কতকগুলি লোক পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল তখন আর কতকগুলি মনুষ্য এক স্থানে বাস করিয়া ভূমি কর্ষণ দ্বারা সংসার পালনে নিযুক্ত হইল।

মৃত্তিকা কর্ষণের জন্য পূর্ব্ব পুরুষদিগের নির্ম্মিত সেই প্রস্তরের যন্ত্রাদি এখন আর কোন কার্য্যে আসিল না, সুতরাং কঠিন এবং উৎকৃষ্ট ধাতু-নির্ম্মিত যন্ত্রের প্রয়োজন হইল। যাহারা এক স্থানে স্থিরভাবে বাস করিতে লাগিল, পর্ণকুটীর বা শিবিরে বাস করিতে আর তাহাদের ইচ্ছা হইল না। ক্রমে তাহারা সুন্দর বাসগৃহ, শস্যাগার এবং পশুশালা নির্ম্মাণ করিতে শিখিল।

দিবাভাগে কৃষকদিগকে সমস্ত সময় ক্ষেত্রে থাকিতে হইত এই জন্য অন্য আর এক সম্প্রদায় মনুষ্যকে তাহারা ঘর বাঁধিবার, যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য নিযুক্ত রাখিল। এই রূপে এক একটী করিয়া বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছে, এবং পরস্পরের সাহায্যে এবং বাণিজ্যকার্য্যযোগে নানা স্থানের লোক একত্র সমাজবদ্ধ হইয়াছে। এই রূপে এক একটী মনুষ্য হইতে গৃহস্থ, গৃহস্থ হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে নগর, নগর হইতে মহানগর রচিত হইয়াছে। এই ব্যবসায়ভেদ জাতিভেদের মূল কারণ।

শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যগণ সময়ে সময়ে একত্রিত হইত, সেই উপলক্ষে পরস্পরের নিকট তাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিত এবং আপনাদের মধ্য হইতে কতকগুলি সাহসিক বলবান্ লোককে মনোনীত করিয়া দেশ রক্ষার জন্য তাহাদিগকে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত রাখিত। সকলের অপেক্ষা যে ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী সাধারণ লোকেরা আপনাদের কল্যাণের জন্য শাসনবিধি প্রস্তুত করিয়া তাহার হস্তেই সমর্পণ করিত।

কারণ, যেমন এক্ষণে তেমনি পূর্ব্বকালেও লোকের লোভ হিংসা ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে সচরাচর বিবাদ কলহ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া জনসমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। গ্রাম্য কৃষক এবং নগরবাসী গৃহস্থেরা যদিও নির্ব্বিবাদে শান্তভাবে থাকিতে ভালবাসিত, কিন্তু যে সকল শ্রেণীর লোক পশু-পালক হইয়া দেশে দেশে ফিরিত, এবং যাহারা এক স্থানে বাস না করিয়া কেবল দলে দলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, তাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইত না। এই নিমিত্তে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদাসর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইত। কৃষক ও কারীগরেরা যে সকল উপাদেয় ফল শস্য এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি উৎপাদন ও নির্ম্মাণ করিত, ঐ সকল অলস সুখপ্রিয় যাযাবর মনুষ্যদল তাহার অংশ লইবার জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া বেড়াইত, শেষে উভয় পক্ষের শোণিত উষ্ণ হইয়া ঘোর সমরানল প্রজ্বলিত করিত। বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদের সম্পত্তি কতক বিনষ্ট, কতক হস্তগত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে দাস করিয়া আপনাদের বাড়িতে রাখিত। তখনকার লোকদিগের হৃদয় বড় কঠিন ছিল, কেহ কাহাকে ভাল বাসিতে পারিত না। যাহার বাহুবল ছিল সেই সকল বিষয় অধিকার করিত। তখন সম্পূর্ণ অরাজকতার সময় ছিল।

এ প্রকার অবস্থা সকলের পক্ষেই অমঙ্গলদায়ক; সুতরাং যুদ্ধ বিবাদের পরিবর্ত্তে স্বভাবতঃ ক্রমে ক্রমে শান্তি ও সম্মিলন স্থাপিত হইল, এবং পরস্পরের পরিশ্রমজাত দ্রব্যাদির

বিনিময়ে সুশৃঙ্খলার সহিত বাণিজ্যকার্য্য চলিতে লাগিল। কৃষকের খাদ্য অভাব তাহা অপেক্ষা অধিক শস্য উৎপন্ন হওয়াতে সেই উদ্বৃত্ত শস্য পশুপালকদিগের পশু এবং কারীগরদিগের শিল্প দ্রব্যের সহিত সে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিনিময় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা সকলেই সুখী হইল, জনসমাজও নিরাপদ হইয়া উঠিল।

যে পর্য্যন্ত টাকা পয়সার সৃষ্টি হয় নাই, তত দিন কাহার কোন একটী দ্রব্যের অভাব হইলে তাহা ক্রয় করিবার জন্য আর একটী সামগ্রীর আবশ্যক হইত। এক জন কৃষকের একটী গোরুর আবশ্যক, মুদ্রার অভাবে তাহাকে হয়ত দুই চারি মোন ধান্য স্কন্ধে লইয়া গোরু ক্রয় করিতে যাইতে হইল। এই রূপ বিনিময় কার্য্য দেখিতেও যেমন কদর্য্য, ব্যবসায়ির পক্ষেও তেমনি ইহা অসুবিধাজনক; একটী সামান্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য একটী গুরুতর দ্রব্য স্কন্ধে করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত নহে। এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সকলে এক মত হইয়া লঘুভার অথচ চিরদিন সমান মূল্যবান এবং স্থায়ী এমন একটী পদার্থ প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিল। এইরূপে ক্রমে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। প্রথমে পিতলের মুদ্রা, পরে দুষ্প্রাপ্য রজতঃ কাঞ্চনের মুদ্রা চলিত হইয়াছে। সোণা রূপা প্রথম হইতেই লোকের নিকট অতি মূল্যবান্ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। যাহার ঘরে অনেক ছাগ গোরু মেষ মহিষ থাকিত তাহাকেও পূর্ব্বকার লোকেরা ধনী বলিয়া গণনা করিত।

# ভাষা।

মনুষ্যের বাক্‌শক্তি কোথা হইতে কি রূপে উৎপন্ন হইল তদ্বিষয়ে জ্ঞানীরা চিরদিন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। অনেক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইহার মূলান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কোন স্থির মীমাংসা এ কাল পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। ভাষার গতি অতি অদ্ভুত। ইহা আপনার অন্তরনিহিত শক্তিপ্রভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত চিরকাল দেশভেদে নানা রূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র ও শাসনপ্রণালী দ্বারা এক্ষণে এত যে চেষ্টা হইতেছে, তথাপি ইহার অপ্রতিহত স্বাভাবিক উন্নতির গতি কেহই অবরুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না। বিশুদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় সাধু ভাষাকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যস্বভাব আপনার নিজ ভাষা প্রচার করিতে কথনই ক্ষান্ত হয় না। ইহার উপর মনুষ্যের সম্পূর্ণ শাসন চলে না। সংস্কৃত ভাষার উপর মনুষ্য নানা প্রকার শাসনপ্রণালী বিস্তার করিয়া তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু প্রাকৃত ভাষার উপর কাহার কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রাকৃত ভাষা চিরদিন সংস্কৃত ভাষাকে পোষণ বর্দ্ধন ও রূপান্তরিত করিয়া আসিয়াছে এবং করিবে। ক্রমোন্নতি সহকারে মনুষ্যের মনে যেমন নূতন নূতন ভাবোদয় হয়, তাহা প্রকাশের জন্য তেমনি প্রাকৃত ভাষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাসা বদ্ধ স্বভাব, প্রাকৃত ভাষা মুক্ত এবং স্বাধীন স্বভাব। স্থানের দূরত্বের

সহিত এক দেশের ভাষা অল্পে অল্পে অন্য দেশের ভাষাতে কেমন পরিণত হইয়া আসিয়াছে তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। আবার এক দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। যে ঈশ্বর বিবিধ প্রকার স্বর উচ্চারণ করিবার জন্য মনুষ্যকে সুন্দর বাক্‌যন্ত্র প্রদান করিয়াছেন তিনিই তাহাকে বাহ্য পদার্থ ও মানসিক ভাব সমূহের নাম করণের শক্তি দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন।

বস্তুর প্রকৃতি এবং গুণানুসারে যে সকল শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মনুষ্যের অনুকরণবৃত্তির ফল। শব্দের সহিত বস্তুর প্রকৃতি আলোচনা করিয়া আমরা ইহার তত্ত্ব অনুধাবন করিতে পারি, কিন্তু সমস্ত শব্দ এই রূপ নিয়মে রচিত হয় নাই; সুতরাং অনুকরণ প্রবৃত্তি ভাষা উৎপাদনের মূল বা এক মাত্র কারণ হইতে পারে না। ভাষার অবশিষ্ট ভাগ যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে স্থান অতি গভীর, তথায় কেহ অবতরণ করিতে সমর্থ নহে। ভাষা উৎপাদনের মূল শক্তি মনুষ্যপ্রকৃতিতে নিহিত ছিল; তাহা আপনার স্বভাবানুসারে বাহ্য অবস্থারূপ বিভিন্ন প্রকার ছাঁচে পড়িয়া দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত বহির্গত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মনুষ্যের স্বভাব প্রথমাবধি আপনা হইতেই তাহাকে প্রয়োজনীয় বস্তু সকলের সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। ভাষাও সেই রূপ অন্তরস্থ শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়া আপনিই আপনার পথ করিয়া লইয়াছে। ঈশ্বর যাহা মনের মধ্যে রোপণ

করিয়া দিয়াছেন এবং বাহির হওয়াই যাহার উদ্দেশ্য, তাহা আপনার বলে যে কোন রূপে হউক, বাহির হইয়া পড়িবেই পড়িবে। আন্তরিক ভাব ও অনুকরণ প্রবৃত্তি ভাষা উৎপত্তির কারণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

মনের ভাব বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য যে ইচ্ছা তাহাই ভাষা উৎপাদনের প্রধান কারণ। মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্য কথন আরম্ভ হইয়াছে। মনের ভাব তিন প্রকারে প্রকাশ করা যায়,—বাক্য কথন, লিখন, ইঙ্গিত। এই ত্রিবিধ প্রণালীঅনুসারে সভ্য অসভ্য সকলে আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। অস্ফুট শব্দ ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া বিশুদ্ধ ভাষা রচনা করিয়াছে। প্রথমে অতি ছোট ছোট অল্প সংখ্যক কতিপয় শব্দ মনুষ্যের অধিকারে ছিল; সেই শব্দ এবং হস্ত পদ সঞ্চালন প্রভৃতি বাহ্য ভাব ভঙ্গী দ্বারা তাহারা পরস্পরের নিকট মনের ভাব জ্ঞাপন করিত। অর্থাৎ ভাষার দরিদ্রতা হেতু একটী মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে বাক্য এবং ভাব ভঙ্গী উভয়েরই প্রয়োজন হইত। এই জন্য শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গীকেও এক প্রকার ভাষা বলা যাইতে পারে। এক্ষণেও আমরা মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সচরাচর "হাঁ" কি "না" ব্যক্ত করিয়া থাকি। যে দেশের ভাষা আমরা ভাল রূপ অবগত নহি, সেখানে ভ্রমণ করিতে হইলে অঙ্গ সঞ্চালন মুখ ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা প্রায় ভাষার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। বাহ্যভাব ভঙ্গী দ্বারা অন্তরের এবং বাহিরের সমস্ত ভাবই প্রায় ব্যক্ত হইতে পারে। এইরূপ অঙ্গ সঞ্চালন প্রণালীতে এমন কি, পূর্ব্বকালে লোকেরা

নাটকাভিনয় পর্য্যন্ত করিত। সে প্রকার অভিনয় এক্ষণেও চলিত আছে, তাহা দ্বারা মনের হর্ষ শোক রাগ দ্বেষ ঘৃণা উপহাস সমস্তই প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডের মূকবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ইঙ্গিতে এমন দ্রুতবেগে মনের ভাব ব্যক্ত করে যে অনেকে কথা কহিয়া তেমন পারে না। মূকেরা অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে পারে। অসভ্য লোকেরাও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সুদক্ষ। বাক্যকথন ভাষা বহু প্রকার, কিন্তু অঙ্গভঙ্গীর ভাষা সবদেশে একরূপ। ইঙ্গিতের ভাষা বাক্য কথন অপেক্ষা অনেক সময় স্পষ্ট এবং বোধসুলভ হয়। এক শব্দের নানা অর্থ হইতে পারে, কিন্তু মুখ চক্ষের ভাব, গলার স্বর দ্বারা কোন্ অবস্থায় তাহার কি অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে পরিষ্কার বুঝা যায়। ইঙ্গিতের যেমন ভাষা আছে, তেমনি সাঙ্কেতিক লিখন প্রণালী আছে। এক্ষণে আমরা কতকগুলি বর্ণ এবং তাহার যোগাযোগ দ্বারা মনের সকল ভাব ব্যক্ত করি, পূর্ব্বে এক সময়ে অক্ষরের পরিবর্ত্তে কতকগুলি চিহ্ন এবং মূর্ত্তি প্রচলিত ছিল, তাহা দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। ভাষা এবং লিখন প্রণালী কিরূপে সমাজে প্রচলিত হইল ইহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। কোন শব্দ বা তাহার বাহ্য আকার প্রচলিত করিবার জন্য সভা ডাকিতে হয় নাই, দশজনে পরামর্শ করিয়া এ কার্য্য আরম্ভ করে নাই, অথচ অবাধে সমাজের মধ্যে তাহা গৃহীত হইয়াছে। কোন সম্রাট বা দলপতির সাধ্য নাই যে একটা ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ভাষা সাধারণ সম্পত্তি।

বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্য যেমন এক সাধারণ শক্তি হইতে

উৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি তাহারা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে তাহাও এক অবস্থা হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত জাতি আছে ভাষা তদপেক্ষা অনেক বেশী। কেহ কেহ বলেন পৃথিবীতে তিন সহস্রের অধিক ভাষা প্রচলিত আছে। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধানের পর এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, সমস্ত প্রাকৃতিক ভাষা হইতে প্রধানতঃ তিনটী অবিমিশ্র সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীতে প্রচলিত হয়; এবং এই ভাষাত্রয় অযত্নসম্ভূত প্রাকৃত ভাষা সকলের মধ্য হইতেই নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে।

কিছু কাল পূর্ব্বে লোকের এই রূপ সংস্কার ছিল যে য়িহুদীদিগের হিব্রু ভাষাই সকলের আদি ভাষা; কিন্তু পরে শব্দতত্ত্ব অনুসন্ধান দ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের সংস্কৃত, পারসীদিগের জেন্দ, এবং গ্রীসিয়ানদিগের গ্রীক, পুরাতন রোমানদিগের ল্যাটিন, ভারতবর্ষ ও ইউরোপের সমস্ত প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষা, এই সমস্ত ভাষা এক ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান অথবা আর্য্যপরিবার হইতে সমুৎপন্ন।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। ভূমি কর্ষণ, গৃহ ও রাজপথ নির্ম্মাণ, বস্ত্র বয়ন, এক শত সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করা এ সমস্ত তাঁহারা যে অগ্রে শিখিয়াছিলেন তাহা ভাষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর পবিত্র সম্বন্ধ তাঁহাদের মধ্যে প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল।

যে তিনটী প্রধান ভাষার কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি

উপরিউক্ত কয়েকটী তাহার একটী। দ্বিতীয় বিভাগের মধ্যে হিব্রু, আর্ব্বি ও আফ্রিকার কতিপয় ভাষা। তৃতীয় বিভাগে আসিয়ার অবশিষ্ট লোকদিগের ভাষা সন্নিবিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত চীনদিগের এক নূতন ভাষা আছে। ভাষার উন্নতি মানবস্বভাবের উন্নতির এক বিশেষ অঙ্গ।

## হস্তলিপি।

আদিমাবস্থায় অক্ষর সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যের মনের ভাব ছবি দ্বারা অঙ্কিত হইত। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত এইরূপ প্রথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। পৃথিবীর নানা স্থানে এখনও যে সকল অসভ্য জাতি বাস করে তাহাদের মধ্যে এ রীতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। সমাধি স্থানে, বৃক্ষ-গাত্রে, শৈলোপরি কোন ঘটনা বা সংবাদ এই রূপ ছবির আকারে লিখিত থাকিত। কিছু কাল পরে এই অসভ্য প্রথার পরিবর্ত্তে শব্দার্থ প্রকাশক কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রবর্ত্তিত হয়। তাহার পরে সেই শব্দ ভাঙ্গিয়া তাহাকে এক একটী অক্ষরে বিভক্ত করা হইয়াছিল। তদনন্তর সাধা-রণের মতানুসারে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন সর্ব্বদা ব্যবহা-রের জন্য সৃষ্ট হয়; সেই চিহ্ন অক্ষরের রূপ ধারণ করিয়া পরে বর্ণমালা নামে প্রচলিত হইয়াছে। কাহার কাহার মতে এই সকল অক্ষরে পূর্ব্বপ্রচলিত ছবির আভাস দৃষ্টিগোচর হয়। হিব্রু ভাষার প্রথমাক্ষরের অর্থ গরু, এইজন্য গরুর মাথার ন্যায় তাহার আকৃতি। জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণ সূর্য্য

চন্দ্র নক্ষত্রের স্থানে ১, ২, ৩, চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। যদিও আমরা ভাষার স্থানে কোন চিহ্ন এখন ব্যবহার করি না, কিন্তু উক্ত প্রথা অনুসারে এখনও নাম স্বাক্ষর করার প্রথা এ দেশে চলিত আছে। যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহারা ঢ্যারা সহি করিয়া থাকে।

## গণিত শিক্ষা।

অসভ্য জাতিরা এক্ষণে ক্রমে অঙ্ক গণনা শিক্ষা করিতেছে। কিন্তু অনেকে এখন পর্য্যন্ত চারি সংখ্যার অধিক গণনা করিতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে কোন উচ্চ সংখ্যক গণনা করিবার শব্দ চলিত নাই। হস্তাঙ্গুলীর দ্বারা পৃথিবীর সকল স্থানে সহজ গণনার কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। এ জন্য অনেকানেক জাতির মধ্যে "হস্ত" এবং "পাঁচ" সমানার্থে ব্যবহৃত হয়। অজ্ঞান অসভ্য লোকদিগের মধ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত ৫, দুই হস্ত অথবা অৰ্দ্ধ মনুষ্য ১০, দুই হস্ত এক পদ ১৫, হস্ত এবং পদ অথবা এক জন মনুষ্য ২০, এই রূপে গণনার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। অতি পুরাকালে উপল খণ্ডের দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইত। কোন কথা ভুলিয়া যাওয়ার ভয়ে যেমন পরিধেয় বসনে গ্রন্থি বন্ধন করা রীতি প্রচলিত আছে, সেইরূপ রীতিতে পূর্ব্ব কালের লোকেরা হিসাব রাখিত। এক্ষণে আমরা যে স্মরণার্থ বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখি তাহা পূর্ব্বকার গণনা রীতির অনুকরণ মাত্র। অসভ্যজাতির মধ্যে এখনও এইরূপ রীতিতে গণনার কার্য্য হইয়া থাকে।

# মনুষ্যের দেশান্তর প্রস্থান।

মনুষ্যজাতির আদি বাসস্থান মধ্য-আসিয়ার নিকট কোন স্থানে ছিল এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। থাইবার-পাশে এখনও এক জাতীয় মনুষ্য আছে তাহাদিগকে উক্ত আদিমবাসীদিগের বংশ বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন। তাহারা অতিশয় সুন্দর এবং বলবান্। যাহারা উক্ত প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের কেহ কেহ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নীলনদের জলসিক্ত উর্ব্বরা ভূভাগে চলিয়া যায় এবং তথায় থাকিয়া ইজিপ্সিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কেহ কেহ বা ইউরোপের উত্তর উপকূলনিবাসী হইয়াছিল। যাঁহাদিগকে আমরা পূর্ব্ব পুরুষ বলি, সেই আর্য্যগণ মধ্য-আসিয়া হইতে গ্রীক, রোম, জার্ম্মণ, ইরাণ, ভারতবর্ষ ইত্যাদি স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ঐ সকল দেশের প্রাচীন ভাষা এবং তদন্তর্গত ভাবের একতা দেখিয়া আধুনিক পণ্ডিতগন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উক্ত দেশ সকলের অধিবাসিগণ এক বংশসম্ভূত।

জল বায়ুর গুণে যেমন শরীরের বর্ণ বিভিন্ন প্রকার হয়, তেমনি জাতিবিশেষের উন্নতি এবং বিভিন্ন প্রকারের মানব-জীবন বাসস্থানের অবস্থার তারতম্যানুসারে ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। এক জাতি মনুষ্য অপেক্ষা অপর এক জাতি মনুষ্য উন্নত হইয়া তাহাদিগের উপর যে রাজত্ব করে প্রাকৃতিক অবস্থাই তাহার অন্যতর কারণ। নতুবা বর্ব্বর অসভ্য এবং সভ্য সমাজের অবস্থা এত অধিক উচ্চ নীচ হইবার অন্য

কারণ আর কি হইতে পারে? অদ্যাবধি মানবসমাজের শৈশবাবস্থা পর্ব্বত ও দ্বীপবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। যে সকল বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রচুর তৃণ পত্রে আচ্ছাদিত ছিল পশুপালকেরা সেখানে গিয়া পশুচারণ করিত এবং তদ্রূপ স্থানের অন্বেষণে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই হেতু তাহাদের অবস্থার কিছুই উন্নতি হয় নাই। যে দেশের ভূমি সমধিক উর্ব্বরা এবং বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর ছিল, তথাকার অধিবাসিগণ কৃষক ও কারীগর হইয়া সহজে জ্ঞান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা সমুদ্র উপকূলে এবং দ্বীপের মধ্যে বাস করিত তাহারা নির্ভীক এবং সাহসী হইয়াছে।

এই প্রস্তাবে যাহা বর্ণিত হইল তাহা কোন জাতি বিশেষের ইতিহাস নহে। যাহা তোমরা শুনিলে ইহা সমস্ত মানবজাতির উন্নতির আদি বৃত্তান্ত। মনুষ্যজাতির পুরাবৃত্ত প্রথমে যখন আরম্ভ হয়, এ সকল তখনকার কথা। যাহা হউক, আমরা সংক্ষেপে প্রধান প্রধান জাতিদিগের বিভিন্ন প্রকার অবস্থাও এ স্থলে কিছু বর্ণন করিব। আপনাদের মাতৃভূমির সাধারণ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কে কোথায় গমন করিলেন ইহা দ্বারা তদ্বিবরণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অবগত হওয়া যাইবে।

যে সকল জাতি ইউরোপের উত্তর প্রান্তে ভ্রমণ করিত তাহারা বহু কালাবধি নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল। কিছু কাল পরে খনিজ পদার্থের গুণ অবগত হইয়া তদ্দ্বারা সুদৃঢ় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করত তাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নতাবস্থায়

উত্থিত হয়। যখন তাহারা জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিয়া সমুদ্রে গমনাগমন করিতে লাগিল তখন নিরীহ প্রজাগণের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইল। উহারা দলবদ্ধ হইয়া যথা তথা দুর্ব্বল লোকদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিত এবং দ্বীপবাসী মনুষ্যদিগের উপর আক্রমণ করিত।

অন্য আর কতিপয় জাতি মনুষ্য পারস্য দেশে, প্যালেষ্টাইনের সমুদ্র উপকূলে, এবং ইজিপ্টতে বসতি করিয়াছিল। এব্রাহেমের পূর্ব্বে যে সমস্ত নরপতিগণ ও প্রবল পরাক্রান্ত জাতি সে দেশে আধিপত্য করিত এই সকল জাতি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। আর কতকগুলি লোক আসিয়া ও আমেরিকার সীমান্তবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ প্রণালী উল্লঙ্ঘন করত নূতন মহাদ্বীপে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা দক্ষিণ আমেরিকা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিল তাহাদের রচিত নগরাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তাহাদের বিগত মহত্ব ব্যক্ত করিতেছে।

## সমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি।

মনুষ্যজাতির শৈশব কালের ইতিহাস মধ্যে আমরা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই দেখিতেছি! সেই আদিম অসভ্য মনুষ্য হইতে কি রূপে এখন সুসভ্য মহাজ্ঞানী পণ্ডিত লোক সকল উৎপন্ন হইল তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বিবস্ত্র হইয়া উদাসীনের ন্যায় মনুষ্য পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইল, হইয়া প্রকৃতিকে হস্তের যন্ত্র করত এক্ষণে সুখের

উন্নত মঞ্চে উত্থিত হইয়াছে। এখন প্রচুর জ্ঞান অর্থ সুখ সম্পত্তির ভাণ্ডার তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল বর্ত্তমান সুখ স্বচ্ছন্দতার ভিত্তি প্রথমে যাঁহারা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। যিনি প্রথমে চকমকির পাথর ভাঙ্গিয়া সামান্যাকারে অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তিনি ভাস্করদিগের পিতা স্বরূপ। যিনি বাল্যক্রীড়ার ন্যায় প্রথমে মনুষ্য ও জন্তু বিশেষের ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাঁহা হইতে বড় বড় গুণবান্ চিত্রকর উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বিচিত্র রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাতাদিগের আদি গুরু। প্রথমে যিনি বল্গা হরিণের অস্থি ছিদ্র করিয়া বংশীবাদন করিলেন এবং চর্ম্মসূত্রকে সবলে আকর্ষণ করত বীণা বাজাইলেন তিনি বর্ত্তমান সঙ্গীতরসজ্ঞ গুণিগণের অধ্যাপক। যিনি মনের সরল ভাব সকল প্রথমে ছন্দোবন্ধে গ্রথিত করিলেন তিনি মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপিয়ারের পিতা। এবং যিনি সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ সকলের গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতগণের প্রথম শিক্ষক।

## মনুষ্যসমাজের ভগ্নাবস্থা।

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু বর্ণিত হইল তাহাতে কেবল মনুষ্যসমাজের উন্নতিরই সমাচার আমরা অবগত হইলাম। কিন্তু জনসমাজের উন্নতির স্রোত অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত হয়

নাই। মধ্যে মধ্যে এমন সকল সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন কত কত প্রতিষ্ঠালব্ধ জাতি এক কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মনুষ্যের পুরাতন কীর্ত্তি এবং ইতিহাস ইহার নিদর্শন। কত কত জাতি একবার বিদ্যা সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠিয়া আবার পতিত হইয়াছে। এমন অনেক লোক ছিল যাহাদের কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সংসার একটী অভিনয় ক্ষেত্র বিশেষ। এক জাতি মনুষ্য সুখ স্বচ্ছন্দে আহ্লাদ আমোদে কিছু কাল অতিবাহিত করিয়া গেল, স্বীয় বাহুবলে এবং বুদ্ধিকৌশলে প্রবল প্রতাপের সহিত আধিপত্য বিস্তার করিল, কালের ভীষণ প্রবাহে তাহাদের সমস্ত সুখ সমৃদ্ধি যশঃ কীর্ত্তি আবার সমূলে উৎপাটিত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। কিন্তু তাহারা যে উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা এক কালে তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইল না; তাহাদের উপার্জ্জিত জ্ঞানরত্ন সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কোন জাতীয় মনুষ্য যখন ভ্রষ্টাচারের এক সীমায় গিয়া উপনীত হয় তখন তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। রোম গ্রীস য়িহুদী জাতি তাহার প্রমাণ। স্বাধীনতার বলে মনুষ্য অতি ঘৃণিত পাপাচরণ দ্বারা আপনিই শেষে আপনার অমঙ্গল আনয়ন করে। স্বভাবের মঙ্গল নিয়ম পুনঃ পুনঃ ভঙ্গ করিলে তাহার প্রতিফল অবশ্যই পাইতে হয়। যখনই কোন জাতি মদ্যপান ব্যভিচার স্বার্থপরতা পরহিংসা পরস্বাপহরণ অমিতাচার প্রভৃতি অতি লজ্জাজনক কার্য্যে এক কালে

নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে তখনই মহামারী রাজবিদ্রোহ সমাজ-বিপ্লব ধর্ম্মহানি উপস্থিত হইয়া সে জাতির পাপদূষিত মূলকে একবারে উৎপাটন করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু যদিও উন্নতির প্রবাহ মধ্যে মধ্যে থামিয়া গিয়া কখন কখন পশ্চাতের দিকে তাহার গতি ফিরিয়া আইসে, তথাপি সাধারণ ভাবে যে জগতের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রহিয়াছে; পৃথিবী অধোগতির দিকে যাইতেছে না, বরং উৎকৃষ্টতার দিকেই ধাবিত হইতেছে তাহা আহ্লাদ ও বিশ্বাসের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। ভূতকালের বিষয়ে অনেকে অনেক অত্যুক্তি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে পূর্ব্বকালের যাহা কিছু সকলই উৎকৃষ্ট; তখন লোকের কোন বিষয়ে অসুখ ছিল না, দ্রব্যাদি যথেষ্ট জন্মিত, কাহাকেও দুঃখ পাইতে হইত না। এরূপ অত্যুক্তির একটী গূঢ় কারণ এই যে, যাহারা প্রাচীন কালের বিষয় কিছুই জানে না তাহারা সে সময়ের বিশেষ পক্ষপাতী; তাহারা যে বিষয়ে যত অনভিজ্ঞ সে বিষয়ের তত প্রশংসা করিয়া থাকে। আর একটী কারণ এই যে, পূর্ব্বকালের কোন ব্যক্তি বিশেষের গুণের কথা শুনিয়া সকলকেই সেইরূপ মনে করিতে অনেকের ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ প্রকার অনুচিত প্রশংসা-বাক্য গ্রাহ্যযোগ্য নহে। দূরের বস্তু বলিয়া তাহারা ভূতকালকে আপনার মনের যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভাব দিয়া সজ্জিত করিয়া তোলে, এই জন্য তাহা এত ভাল লাগে। বস্তুতঃ এক্ষণকার কালে এক জন সামান্য শ্রমজীবী লোক যে রূপ সুখে দিন যাপন করিতেছে তখনকার রাজা এবং রাণীরা

তদপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকিতেন। অতএব সেই পুরাতন সত্যযুগ পুনরায় প্রত্যাগমন করুক এ প্রকার ইচ্ছা করা কিম্বা ভূতকালকে এক কালে অগ্রাহ্য করা উভয়ই মূঢ়তার কার্য্য। সকল কালের মধ্যে বিধাতার শাসন বিদ্যমান আছে, উন্নতির প্রত্যেক সোপানে তাঁহার মঙ্গল নিয়মের চিহ্ন অবস্থিতি করিতেছে। ঈশ্বর যেমন বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা, তেমনি তিনি আপনার কৃপা হস্তদ্বারা সর্ব্বদা ইহাকে পরিচালিত করিতেছেন। তিনি যে জগৎকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন কিম্বা ইহাকে বিনষ্ট হইতে দিবেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। জগতের মঙ্গল করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। পরমেশ্বর আমাদিগের প্রত্যেককে যে সকল কার্য্য করিবার জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন তাহা যদি আমাদের দ্বারা এক যুগে সম্পন্ন না হয় তবে যুগান্তরে অন্যের দ্বারা তাহা উৎকৃষ্টরূপে সুসম্পন্ন হইবে। কিন্তু যে সমস্ত কার্য্য ঈশ্বর আমাদের হস্তের নিকট আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছেন তাহা যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহিত হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। যদিও আমরা তাহাদিগকে সামান্য মনে করিয়া অগ্রাহ্য করি, কিন্তু যিনি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু এবং প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডলকে রচনা করিয়াছেন, তিনি তাহা করেন না। তিনি আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যের গুরু লঘুর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু কি রূপে এবং কি ভাবে আমরা তাহা সম্পন্ন করি তাহাই কেবল তিনি দেখেন।

অনেকে হিতকর কার্য্যকে অধিক মূল্য প্রদান করেন, সদ্ভাবে সত্য পথে থাকিয়া তাহা সম্পন্ন হইল কি না

তাহার প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি করেন না। তাঁহাদের মতে মিথ্যা আচরণ করিয়াও মঙ্গল কার্য্য করা উচিত। 'যেরূপেই হউক মঙ্গল হইলেই হইল, তাহাতে যদি কিছু অসদাচরণ হয় হউক, এই কথা তাঁহারা বলেন। কিন্তু আমরা বলি তেমন শত শত হিতকর কার্য্য জড়যন্ত্র দ্বারা কি হইতে পারে না? রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অন্যান্য বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যে প্রচুর মঙ্গল ফল উৎপন্ন হয়, পরিমাণে তাহার সহিত মনুষ্যের কার্য্যের কি তুলনা হইতে পারে? অতএব কার্য্যের কিছুমাত্র মূল্য নাই, যে ভাবে তাহা সম্পাদিত হয় তাহা যদি সৎ হয় তবে তাহাই প্রশংসার বিষয়।

## সমাজ শাসন।

মৃগয়া, পশুপালন এবং কৃষিকার্য্য ক্রমান্বয়ে এই তিনটি অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আদিম মনুষ্যগণ যথারীতি সমাজবদ্ধ হইয়াছে। সমাজবন্ধনই জ্ঞান সভ্যতা ধর্ম্মনীতির কারণ; একত্রে যদি তাহারা দলবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে চিরদিন অসভ্য অবস্থায় থাকিয়া মরিয়া যাইত, বংশ পরম্পরায় আর উন্নতির স্রোত চলিয়া আসিত না। কিন্তু পরমেশ্বর মনুষ্যকে স্বজাতিসঙ্গলিপ্সা দিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। এই জন্য সে একাকী থাকিতে পারিল না। প্রথমাবস্থায় যত দিন তাহারা বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, মৎস্য মাংস আহরণার্থ জলে স্থলে ভ্রমণ করিত, তখন প্রত্যেকেই স্বাধীন ছিল। আহারের অনুরোধে একা একা

নানা স্থানে তাহাদিগকে বেড়াইতে হইত, সুতরাং কেহ এক স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে পারিত না। সে অবস্থা নিতান্ত ক্লেশকর ছিল। রৌদ্র বৃষ্টি শীত পথশ্রান্তি ক্ষুধা পিপাসা ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রণা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইত। ব্যাধবৃত্তিতে এইরূপে অনেক ক্লেশ পাইয়া অবশেষে কতকগুলি লোক পশুপালনের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পশুপালকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল বলিতে হইবে। কারণ গো, মেষ, ছাগ, মহিষ পালন দ্বারা অন্ন বস্ত্রের দুঃখ বিদূরিত হয়। যে সকল জীব জন্তু পূর্ব্বে বনচারী ছিল তাহারা এক্ষণে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গৃহবাসী হইল। পশুপালকগণের সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হইত বটে, কিন্তু তাহা অন্যান্য বিষয়ে অনুন্নতির কারণ ছিল। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি সকল বিভিন্ন প্রকার কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতই পরিচালিত হয়, ততই আঘাত প্রতিঘাত দ্বারা তাহা প্রস্ফুটিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। পশুপালকগণ সময়ে সময়ে গোচারণের ভূমি লইয়া কখন কখন বিবাদ করিত এই মাত্র। অন্য বিষয়ে তাহারা নিরাপদে ছিল। কিন্তু সে নিরাপদ অবস্থা সভ্যতার এক বিষম অন্তরায়। মৃগয়া এবং পশুপালন উভয়ই যখন ক্লেশজনক হইয়া উঠিল, তখন কৃষি কার্য্যের সূত্রপাত হইল। কৃষকদিগকেই সভ্যজাতির আদিপুরুষ বলা যাইতে পারে। তদুপলক্ষে মনুষ্যকে বাধ্য হইয়া এক স্থানে বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সমাজসঙ্গঠন কার্য্য সহজে সম্পাদিত হয় নাই। একটি পুরাতন অভ্যাস এবং প্রাচীন প্রথা ছাড়িয়া অপর কোন

এক নূতন পথে গমন করা মনুষ্যের পক্ষে বড়ই কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার। তৎকালে মনের ভিতর এক মহা সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই কারণে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর চির-পরিব্রাজকেরা কৃষি ব্যবসায় অবলম্বনের সময় অতিশয় অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিল। প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত ভূমিকর্ষণ কার্য্যে তাহারা ঘৃণা প্রকাশ করিত। যাহারা শিবিরবাসী হইয়া দেশে দেশে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইত, এক্ষণে তাহাদিগকে মৃত্তিকা প্রস্তরের সঙ্কীর্ণ ভিত্তির মধ্যে বদ্ধভাবে থাকিতে হইল। স্বাধীন ভাবে সমস্ত কার্য্য করা যাহাদের অভ্যাস, শাসনভার বহন তাহাদের সংস্কার এবং রুচিবিরুদ্ধ কার্য্য। স্বাধীনতার স্থানে অধী-নতা, স্বার্থপরতার স্থানে সাধারণহিতচেষ্টা, অরাজক-তার মধ্যে বাধ্যতা, এই ঘোর পরিবর্ত্তনের মূল কারণ ধর্ম্ম নীতি। ভারতবর্ষ, মিসর, পারস্য, এবং ইহুদী দেশের লোকেরা বুদ্ধিমান ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের সাহায্যে দ্রুত গতিতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়াছে। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মশাসনের বিধি ব্যবস্থা ছিল না, তাহারা এখনও অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত।

কৃষি কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে জনশূন্য প্রান্তর অরণ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরে শোভা পাইতে লাগিল। এক সঙ্গে বহুলোক থাকিতে গেলেই শাসন বিধি নিয়মপ্রণালীর আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। মানবের অশিক্ষিত বন্য প্রকৃতিকে ভগবান্ আত্মশাসন প্রণালীর ভিতর দিয়া এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন। গ্রামের মধ্যে যে দুই এক জন

বলবান্ এবং বুদ্ধিমান লোক জন্মিত, তাহারাই প্রথমে শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইত। গ্রাম্য সর্দ্দার, মণ্ডল, জাতীশ্বর, পুরোহিত, পঞ্চায়েৎগণই ক্রমে জমিদার, রাজা, মহারাজা, সম্রাট, পরিশেষে মৃত্যুর পর তাহারাই দেবতার উচ্চ পদবী লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক প্রথমে যাঁহারা বনচারী উদাসীন নরজাতিকে এক স্থানে বসাইয়া মৃগয়ার পরিবর্ত্তে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, তাঁহারা এক এক জন মহাপুরুষ। পাঁচটা ফলের মধ্যে যেমন একটা ফল অধিক বড় হয়, পশুপালের ভিতর স্বভাবতঃই যেমন দুই একটা অসাধারণ বল ক্ষমতা ধারণ করে, নরকুলের মধ্যেও তেমনি এক এক জন অসাধারণ লোক জন্মে। তাহারাই শাসনকর্ত্তা এবং পরিচালকের কার্য্য করিয়া থাকে। বিধাতার শাসনপ্রণালীর এই নিয়ম এখনও চলিয়া আসিতেছে। কৃষি বাণিজ্য শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি এবং সামাজিক প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতির জন্য এইরূপ প্রতিভাশালী সংস্কারকের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বকালে মিসর, আরব, গ্রীস, রোম, জুডিয়া প্রভৃতি দেশের রাজকর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাসন এক জনের হস্তেই ছিল। মুশা এবং মোহম্মদ উভয় কর্ম্মই করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন দেশে উভয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুইটি সম্প্রদায় নিযুক্ত থাকিত। প্রথমাবস্থায় শাসনকার্য্যে কেহ কাহাকেও নিয়োগ করে নাই, ক্ষমতা বল বুদ্ধি কৌশলে আপনা হইতেই বিশেষ বিশেষ লোক উচ্চ পদে বসিয়াছে; প্রধানেরা নিজেই প্রধান পদের সৃষ্টি করিয়াছে।

অনন্তর সম্পত্তির আবশ্যকতা, তাহা রক্ষা করিবার আবশ্যকতা, এবং নীতি শাস্ত্রের আবশ্যকতা, এই তিনটি অভাব পূরণের জন্য ভূম্যধিকারী, প্রজা, শাসনকর্ত্তা এবং বিচারক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। অসভ্য জাতিরা পূর্ব্বে যখন মৃগয়া করিত, তখন বনের পশুদিগকে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া জানিত; কিন্তু যখন তাহারা কৃষক হইল, তখন আর সে উদার ভাব রহিল না, ক্রমে অধিকার বিভাগ ও সত্বাসত্বের বিধি নিয়ম প্রচলিত হইল। যখন কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিখণ্ড কর্ষণ করিতে হইবে তখন আর তাহা সাধারণ সম্পত্তি থাকিলে চলিবেই বা কেন। চতুর্ব্বিধ অবস্থার পর এই নিজস্ব অধিকার জন্মিয়াছে। প্রথমে সকলে এক সঙ্গে সমস্ত ভূমি চাস করিয়া এক সঙ্গে ফল ভোগ করিত। পরে কতকগুলি লোকের পরিশ্রমজাত শস্য সকলে ভোগ করিতে লাগিল। তদনন্তর দাসেরা চাস করিত, ভূস্বামিগণ তাহার ফল ভোগ করিতেন। পরিশেষে শ্রমজীবিদিগকে বেতন দিয়া ফল ভোগের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। প্রথমাবস্থায় যদি এক যোগে সকলে চাসকর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে সত্বাসত্বের বিবাদে নবপ্রতিষ্ঠিত জনসমাজ শৈশবেই প্রাণ হারাইত। এই জন্য উহা একটি সাধারণ নিয়ম ছিল। বিধাতার শাসনকার্য্য কি চমৎকার! মনুষ্য একলা থাকিলে যে কাজে মন দেয় না, সমাজবদ্ধ হইয়া তাহা সহজে পালন করে। মানবসমাজ সঙ্গঠনের প্রথমাবস্থা হইতেই দুই শ্রেণীর লোকের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এক ধর্ম্মযাজক পুরোহিতদল, অপর

রাজনীতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তৃ সম্প্রদায়। যাহারা শারীরিক শৌর্য্য বীর্য্য সৌন্দর্য্যে বুদ্ধি ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ তাহারা রাজ্যশাসনকর্ত্তা ক্ষত্রিয় হইল। যাহারা ধর্ম্মোৎসাহী, সচ্চরিত্র, জ্ঞানবান্ তাহারা মুনি ঋষি পুরোহিতের পদ পাইল। পরিবারমধ্যে যেমন পিতাই সকল বিষয়ে প্রধান, তেমনি একটি জাতি বা সমাজের শাসন জন্য উপরিউক্ত দুই সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিরাই প্রধান। প্রথমে সাধারণের ইচ্ছায় প্রধান তন্ত্রের শাসন বিধি প্রচলিত হয়। কিন্তু তখন কাহারো একাধিপত্য ছিল না, প্রধান এবং সাধারণ উভয়ে মিলিয়া কার্য্য করিত। এইরূপ শাসনই ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু একবার কতকগুলি লোক যদি প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আর তাহাদিগকে সাধারণের মধ্যে আনা যায় না। সুতরাং প্রধানদিগের পদমর্য্যাদা রাজশক্তি ক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল; তৎসঙ্গে সাধারণের ক্ষমতাও ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। তখন প্রধান পক্ষ সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া আপনাদের স্বার্থ এবং পদমর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজ সম্প্রদায়স্থ কোন এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে সমস্ত ক্ষমতা দিতেন না। পরিশেষে যখন রাজাকে একাধিপত্য প্রদান করা হইল, তখন রাজার পুত্র রাজা হইতে লাগিলেন। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত স্বীয় স্বীয় অধিকার লইয়া রাজায় প্রজায় বিবাদ চলিয়াছিল, এখনও চলিতেছে, চিরদিনই চলিবে। এইরূপ বিষয়কার্য্য এবং দেশশাসন সম্বন্ধে যেমন রাজাই কর্ত্তা, ধর্ম্মশাসন সম্বন্ধে তেমনি পুরোহিতগণ কর্ত্তা হইয়া বসিলা

আছেন। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই কর্ত্তৃত্ব উভয় দলের মধ্যে যিনি অন্যায় রূপে পরিচালনা করেন, জনসাধারণ আসিয়া তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়।

কৃষক দল যেমন সভ্য সমাজের আদিপুরুষ, কারীগর মিস্ত্রী শিল্পী ও বণিকগণকেও সেই সঙ্গে ধরিতে হইবে। সমাজ সঙ্গঠনের প্রারম্ভেই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের প্রয়োজন হইয়াছিল। কর্ম্মকার সূত্রধর না হইলে কৃষিযন্ত্র সকল কে প্রস্তুত করে? রাজমিস্ত্রী ঘরামীরা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া না দিলে কৃষকেরা থাকে কোথায়? এইরূপে একে একে সমস্ত ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইল। কার্য্যবিভাগ না হইলে সংসার চলে না। এক জন যদি সমস্ত দিন চাস করে, তবে ঘর বাঁধিবে কে? যে তাঁতি কাপড় বুনিবে সে কি আবার সূতারের কাজও করিবে? সুতরাং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ প্রয়োজন। কার্য্য বিভাগ হইতেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ধীবর ধোপা নাপিত তেলী মালী কলু সূতার ময়রা মেথর কাঁসারি সেকরা বহুবিধ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তদনন্তর বিদ্যা ধন ক্ষমতায় যিনি শ্রেষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, কালক্রমে তাঁহার কৌলীন্য মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমে মনুষ্য একা একা বনে বনে দিগম্বর বেশে কিছু দিন ভ্রমণ করিয়া শেষে গৃহধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। পরে এক একটি পরিবার হইতে, ক্ষুদ্র পল্লী, পল্লী হইতে গ্রাম, গ্রাম হইতে নগর, নগর হইতে মহানগর রাজধানী রচিত হইয়াছে। যখন গ্রাম নগর রাজধানী নির্ম্মিত হইল, তখন পথে পথে দোকান বসিল, তাহাতে গাড়ী পাল্কী চলিতে

লাগিল, বিদ্যালয় দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ঘোর শ্মশানের মধ্যে যেন নানা বর্ণের বিচিত্র ফুলসকল ফুটিয়া উঠিল। এখন আহার পরিচ্ছদ বাসস্থানের কি পরিপাটীর ব্যবস্থা! এই সমস্ত সুখদ বস্তুর সঙ্গে আবার মদ গাঁজা অহিফেন আসিয়া জুটিল, তাহা খাইয়া কত লোক রোগে ভুগিয়া মরিয়া গেল। কত কত স্ত্রী পুরুষ চোর দুশ্চরিত্র হইল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা, নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, ইত্যাদি নানা রোগে পৃথিবীকে ঘেরিয়া ফেলিল। সুখের সঙ্গে দুঃখ, অমৃতের সঙ্গে গরল, উন্নতির সঙ্গে অধোগতি পরস্পর যেন হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে। এইজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত দুই প্রধান সম্প্রদায়স্থ পুরুষেরা দোষ সংশোধন কার্য্যে এখনও ব্যস্ত রহিয়াছেন। অজ্ঞানতা অসভ্যতার দোষ জ্ঞান সভ্যতায় খণ্ডে, কিন্তু জ্ঞান সভ্যতার মহাপাপ খণ্ডন করিবার পক্ষে ধর্ম্ম এবং নীতি ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। সে ব্যবস্থাও পূর্ব্ব হইতে বিধাতা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমাজবন্ধনের প্রথম হইতেই নীতি বিষয়েও উন্নতি হইয়া আসিতেছে। যখন দুইটি মনুষ্য এক স্থানে বাস করিতে লাগিল, তখন হইতেই নীতির প্রভাব আমরা দেখিতে পাইলাম। নীতিই পরস্পরকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জলের মলিনতা যেমন জলের দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত হয়, মানবসমাজের কলঙ্করাশি তেমনি মনুষ্যত্বের দ্বারাই অপনীত হইয়া থাকে।

---

# নীতি বিকাশ।

সমস্ত সৃষ্টির মূলাধার যিনি, ধর্ম্মনীতির মূলও তিনি। কিন্তু আদিমাবস্থা হইতে মনুষ্যের উন্নতির যেরূপ ব্যবস্থা আমরা দেখিয়া আসিলাম তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, প্রথমে কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার পশুভাব অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধীয় বৃত্তিগুলি উন্মেষিত হয়। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা স্বাস্থ্য সুখ এই গুলি চরিতার্থ করা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার চিন্তা থাকে না। এই সকল অভাববোধ হইতে ক্রমে বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া জনসমাজের বাহ্যশোভা ও দৈহিক সুখোন্নতি সম্পাদন করিয়াছে। এ অবস্থায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজ সকল নিদ্রিত ছিল, সুতরাং মনুষ্যের ব্যবহার আচরণ প্রায় অসভ্য পশুর ন্যায় দৃষ্ট হইত। এই জন্য আমরা প্রথমাবস্থায় দেখিতে পাই, ক্রোধ লোভ দ্বেষ স্বার্থপরতা দুষ্প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অসভ্য মনুষ্যেরা পরস্পরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, মস্তকচ্ছেদন ইত্যাদি অতি নৃশংস কার্য্য অনায়াসে করিয়া থাকে। যাহাদের শরীর অধিক বলিষ্ঠ তাহারাই শ্রেষ্ঠ লোক, দুর্ব্বলদিগের পক্ষে তাহারা কৃতান্ত সদৃশ ছিল।

যদি শরীর আত্মা একত্র জন্মগ্রহণ করিল, তবে প্রথম হইতে আত্মার ধর্ম্মনীতি কি জন্য বিকসিত হইল না? তাহার কারণ এই বোধ হয় যে, শরীর জড় পদার্থ, সে প্রাকৃতিক নিয়মে অন্ধভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সঙ্গে তাহার পোষণোপযোগী বুদ্ধিশক্তি ও স্মরণশক্তি কিছু কিছু প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, ইহার জন্য ধর্ম্মনীতির উপর নির্ভর

করিতে হয় নাই। আত্মা স্বাধীনপ্রকৃতি, এইজন্য তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কিছু বিলম্বে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রথম জীবনের অভ্যাস ও সংস্কার পরজীবনে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করে, সুতরাং নিদ্রিত দুর্ব্বল ধর্ম্মনীতি তাহাদিগকে সহসা শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারে না; তজ্জন্য কিছু দিন ক্রমাগত সংগ্রাম আবশ্যক হয়। পশু ভাবের প্রাধান্য হেতু যখন দেবভাব সকল এইরূপ নির্জ্জীব অবস্থায় থাকে, সেই সময় যত কিছু অন্যায় অত্যাচার অরাজকতা আমরা দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সভ্যাবস্থাতেও তাহার বিলক্ষণ প্রবলতা দেখা যাইতেছে। কাল সহকারে যদিও সামাজিক ও রাজ শাসন প্রভাবে নৃশংস ব্যবহার সকল উঠিয়া যাইতেছে, তথাপি সভ্যতার আকারে অনেক নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখনও এত যে উন্নতি হইয়াছে, তথাপি মনুষ্যের নৈতিক উন্নতি অতি অল্পই লক্ষিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত অবস্থায় যদি সভ্যদেশের লোকেরা নরশোণিত প্রবাহে সুসভ্য ইউরোপকে কলঙ্কিত করিতে পারে, তবে অশাসিত অজ্ঞানাবস্থায় অসভ্য আদিমবাসী মনুষ্যগণ যে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সমরোদ্যত নরশোণিত-লোলুপ সভ্য জাতিকে দর্শন করিয়া যেমন আমরা বলিতে পারি না যে তাহাদের নীতিবোধ নাই, আদিম অসভ্যদিগের পশুবৎ আচরণ দর্শনে তেমনি তাহাদিগকে নীতিহীন জীব বলিয়া এককালে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এ সম্বন্ধে এখনও অনেক

বিষয়ে সভ্য অসভ্য এক সমতল ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে বাহিরের চাকচিক্য, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, পার্থিব সুখসম্ভোগ বিষয়ে অনেক তারতম্য আছে তাহা স্বীকার্য্য, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মনীতিবিষয়ে অধিক ইতর বিশেষ নাই। প্রত্যুত অনেক সভ্য ভদ্রনামধারী ব্যক্তিরা অবকাশ, কুবুদ্ধি এবং অর্থ হস্তে পাইয়া ঘোর বিলাসপ্রিয় দুরাচারী হয় এবং নির্ভয়ে বিচার বুদ্ধি সহকারে দুষ্কর্ম্ম করে; দুঃখী অজ্ঞান শ্রমজীবী ব্যক্তিরা কখন সেরূপ পারে না। তথাপি এই মনুষ্যমণ্ডলী হইতেই দেব সদৃশ লোক সকল জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া দিয়াছেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির পবিত্র বিধান সকল এই মানবপ্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সমাজবদ্ধ হওয়ার পর বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে ধূর্ত্ততা এবং শারীরিক বলের দ্বারা নির্ব্বোধ ও দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিত। কিছু দিন বিশৃঙ্খলার ও অরাজকতার পর আপনা হইতেই ক্রমে সে সকল দুর্ব্বৃত্ততার হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নীতিজ্ঞান ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। আদিম অসভ্য লোকদিগের মন স্বভাবতঃ অতি তরল এবং চঞ্চল, বুদ্ধি বিবেক অপ্রাথর্য্য, কিন্তু তাহাদের কোন কোন ইন্দ্রিয় আশ্চর্য্য শক্তিশালী। দক্ষিণাপথে নেলার প্রদেশে একদল অসভ্য বাস করে, তাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতিশয় প্রবল। বুসমান জাতির দৃষ্টিশক্তি দূরবীক্ষণের ন্যায় সুদূরব্যাপিনী। সিংহলের ব্যাধেরা অত্যন্ত মৃদুস্বরও শুনিতে পায়। উত্তর

আমেরিকার অসভ্যেরা দলমধ্যগত কোন পশুকে একবার দেখিলেই চিনিয়া রাখিতে পারে। গায়েনার লোকেরা পদচিহ্ন দর্শনে কাহার কত বয়স, কে স্ত্রী কেই বা পুরুষ, সমস্ত বলিয়া দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু এ সকল লোকের বুদ্ধি বালকের মত। উৎকৃষ্ট সংসর্গের অভাবে অসভ্যজাতিরা পুরুষানুক্রমে বালকবৎ অবস্থিতি করে। স্বভাবতঃ তাহাদের জ্ঞানোন্নতির গতি এত মৃদু যে সহস্র বৎসরেও কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। মনুষ্যমাত্রেই পরিবর্ত্তনের বিরোধী, বিশেষতঃ অসভ্যজাতি এক অবস্থায় থাকিতে পারিলে আর অবস্থান্তর প্রার্থনা করে না। এক জাতীয় কার্য্যের একটা বুঝাইয়া দিলে তাহারা অন্য একটা আপনা হইতে বুঝিতে পারে না। কোন কার্য্যের নিকট কারণ ব্যতীত অন্য সকল দূর কারণের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে না। দূরদর্শিতা অতিশয় অল্প। দুইটি কারণ এক সঙ্গে বুঝিতে হইলে মহাবিপদ উপস্থিত হয়। গুটিকতক শব্দ থাকে তাহার দ্বারা সকলে মনের সমস্ত ভাব ব্যক্ত করে। কেহ প্রশ্ন করিলে প্রথম দুই একটির উত্তর দিতে পারে, তাহার পর চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন সকল প্রশ্নের একই প্রকার উত্তর দেয়। শেষ এমন গোলযোগ করে যে কিছুই আর বুঝা যায় না। বর্ষ মাস দিবস সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারে না। যাহাতে মস্তিষ্ক পরিচালনা আবশ্যক সে কার্য্যে অসভ্য এবং অশিক্ষিত লোকেরা বড়ই বিরক্ত হয়। তাহারা চিন্তা এবং স্মরণশক্তি ব্যবহার করিতে চাহে না। কিন্তু এক পাল গোরুর মধ্যে একটা

হারাইলে তাহা বুঝিতে পারে, প্রত্যেক গোরুর মূর্ত্তি যেন তাহাদের মনে অঙ্কিত থাকে। কোন নূতন বিষয় জানিবার নিমিত্ত তাহাদের অন্তঃকরণে কৌতূহল জন্মে না। কল্য আবার সূর্য্য উদয় হইবে কি না তাহাও বলিতে পারে না। ঈদৃশ মানসিক উন্নতির অবস্থায় নীতি বিষয়ে আর অধিক কি প্রত্যাশা করা যায়? অসভ্যদিগের মনোগত ভাব সকল সভ্যজাতিরা বুঝিতেও সক্ষম হয় না। তাহাদের স্বভাবে স্নেহ দয়া প্রীতি সকলই আছে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। ফিজি ও নবগিনির অধিবাসিগণ সন্তানকে অতিশয় ভাল বাসে, আবার আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। অস্ট্রেলিয়াবাসীরা অপত্যস্নেহের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু কখন কখন তাহারা সন্তানকে মারিয়া তাহার চর্ব্বিতে মৎস্য ধরিবার টোপ করে, এবং পীড়িত সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। কোন কোন জাতি এক সময় দয়ালু, শান্ত, অপর সময়ে তাহার ঠিক বিপরীত। তাহাদের হাস্য ক্রন্দন বালকের মত যুগপৎ একসঙ্গে দৃষ্ট হয়।

অসভ্যগণ একদিকে যেমন এক অবস্থায় থাকিতে ভালবাসে, তেমনি তাহারা অনুকরণপ্রিয় এবং গৌরবাভিলাষী; এইজন্য উহারা ক্রমে অজ্ঞাতসারে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে। ইহাদের কতকাংশ পশ্চাতে পড়িয়া আছে, কিন্তু সভ্যতার আলোক তাহাদের মধ্যেও এখন প্রবেশ করিতেছে। এখনকার অসভ্যগণও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের তুলনায় অনেক সভ্য ভব্য বলিতে হইবে। ঈশ্বর মানবস্বভাবে জ্ঞান ধর্ম্মনীতির বীজ রোপণ করিয়া এবং

তাহাকে অনুকরণপ্রিয় করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, ক্রমশঃ সেই বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। কোথাও তাহা ফল ফুলে পরিণত, কোথাও বা অঙ্কুর অবস্থাতেই অবস্থিত। কিন্তু প্রথমে এমন অনেক মনুষ্যবংশ জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে, নীতি বিষয়ে যাহাদের সহিত পশুদিগের অধিক প্রভেদ ছিল না। চৌর্য্য, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা কথন, প্রতিহিংসা এ সকল দুর্নীতি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রবল ছিল। বিবাহ সম্বন্ধে অনাচার শিথিল ভাব সমস্ত আদিম অসভ্যদিগের মধ্যেই লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের স্বভাবে দাম্পত্য-প্রেম, পিতৃমাতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ,ভ্রাতৃবাৎসল্য দয়া ন্যায় কৃতজ্ঞতা প্রেম সত্যপ্রিয়তার আভাস যে ছিল না, এ সিদ্ধান্ত কে করিবে? আদিম মানবের মনের গতি কে অবধারণ করিতে সক্ষম? সভ্য রুচি দ্বারা অসভ্য প্রকৃতির সম্যক্ বিচার চলে না।

অতঃপর যথাসময়ে নৈসর্গিক নিয়মে রাজনীতি, ধর্ম্ম-বিধি, সামাজিক শাসনপ্রণালী স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই নীতির নিয়ম সকল মূলতঃ যতই স্বাভাবিক হউক না কেন, সাধারণ এবং নিজ নিজ মঙ্গলামঙ্গল সুবিধা অসুবিধা সুখ ও দুঃখজনক ফলের উপর যে ইহার বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে যাঁহারা লাভ ক্ষতি ফলাফল সুখ দুঃখকে নীতির জন্মদাতা বলেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে আমরা সঙ্গত মনে করিতে পারি না। কারণ তাঁহারা বীজের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বৃক্ষ উৎপাদনের অপর কারণ গুলিই

কেবল ধরেন। তাঁহাদের মতে নীতি যেন একটি বণিক্-বৃত্তি; নাস্তিক হইয়াও তাহা পালন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে দলের এক প্রধান ব্যক্তি পণ্ডিতবর কোমত্ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, "অগ্রে সমাজ গঠিত না হইলে ফলাফল লোকে বুঝিবে কিরূপে? অতএব সমাজ সঙ্গঠনের মূলেতেই ধর্ম্মনীতি অবস্থিতি করিত ইহা মানিতে হইবে।" নীতির পথ অনুসরণ করিলে মঙ্গল হয়, তদ্বিপরীত পথে অনেক বিপদ ঘটে, ইহা ঈশ্বরেরই নিয়ম। আমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি মনের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ন্যায় দয়া প্রীতিবৃত্তি রোপণ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিলে পরিণামে বিপদ উপস্থিত হয়, সুতরাং বিলম্বে বা অবিলম্বে মনুষ্য বাধ্য হইয়া শেষে সত্যের পথে ফিরিয়া আইসে। সৎকর্ম্মের পুরস্কার অবশ্য আছে; কিন্তু যথার্থ নীতিপরায়ণ ব্যক্তি অগ্রে পুরস্কারের বিষয় ভাবে না, নিস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যায়, পরে ফল আপনিই তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে। সকাম অপেক্ষা নিষ্কাম ফল শ্রেষ্ঠ তাহা সকলেই জানে। কোন ফলের প্রত্যাশায় যাহারা সৎকর্ম্মে ব্রতী হয় তাহাদিগকে লোকে স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করে। ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞার নাম নীতি,তাহা ফলাফল-নিরপেক্ষ। এই জন্য অনেক দুঃখ ক্লেশ সহিয়া,প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া কত মহাত্মা তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। এই নিস্বার্থ ধর্ম্মনীতির দ্বারা মনুষ্যের যথার্থ গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদাভাবে সে পশু সদৃশ। দুঃখী বিপন্নকে দয়া করা, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দেওয়া, অক্ষম

দুর্ব্বলকে সেবা করা, অন্যের ন্যায্য অধিকারে লোভী না হওয়া, মনুষ্যমাত্রকে ভালবাসা যদি কেবল বহুদর্শনের ফল হইত,তাহা হইলে সমাজবন্ধনবিহীন লোকমণ্ডলী অসভ্যাবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করিত। অধিকাংশ লোকের এইরূপ অভ্যাস যে স্বার্থ ভিন্ন কেহ কোন কার্য্য করে না, কিন্তু সে স্বার্থের ভিতরেও কর্ত্তব্যবোধ লুক্কায়িত থাকে। অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলও অভ্যাস দোষে স্বার্থপরতার আকার ধারণ করে। পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, ভাই ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রতি স্নেহ প্রীতি, উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ভাল বাসা, ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাব হইতেও বহুবিধ নৈতিক কর্ত্তব্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। অন্যায় নির্দ্দয়তা, স্বার্থপরতা, চৌর্য্য, মিথ্যা কথন, ব্যভিচার, নরহত্যা প্রভৃতি পাপ কোন জাতিসাধারণের ধর্ম্মনিয়ম নহে; ইহা কেবল মনুষ্যের দুর্ব্বলতার ফল। যাহারা দুর্নীতিকে নীতি বলে, তাহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানাভাবে ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়া যায়। যেহেতু মনুষ্য যেমন অবস্থার প্রভু, তেমনি বহু পরিমাণে সে অবস্থার দাস।

নীতির শাসন, ন্যায় ব্যবহার পৃথিবীতে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন নীতিশাস্ত্র এবং ইতিহাস লিখিত হয় নাই,তাহার পূর্ব্বে শ্রুতি পরম্পরায় ইহা প্রচলিত ছিল। রাজশাসন ও সামাজিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সভ্যতার শৈশবাবস্থায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কিরূপ নীতি অবলম্বন করিতেন, মহাভারত পাঠে তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তাহার পূর্ব্বের অবস্থা

কিরূপ ছিল তাহা যিনি জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি বর্ত্তমান অসভ্য জাতির অবস্থা অবলোকন করুন। এই নীতি-বিকাশ সব দেশে এক প্রকার নহে। অসভ্যদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ, মিথ্যা কথন প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু নির্দ্দয়তা পরস্বাপহরণ অনেক স্থলে প্রচলিত। কোন কোন জাতির মধ্যে দয়া ন্যায় আতিথেয়তা অধিক। বিবাহিতা নর নারীর ব্যভিচার দোষ অনেকের মধ্যেই দণ্ডার্হ, কিন্তু তৎপূর্ব্বে অধিকাংশ অসভ্যেরা যথেচ্ছাচার করে। যে অবধি সদসদজ্ঞানের বোধশক্তি আরম্ভ হইয়াছে সেই হইতে মনুষ্য স্বীয় জীবনের দায়িত্ব অনুভব করিতেছে। ধর্ম্মনীতির বন্ধনে জনসমাজ সম্বদ্ধ না হইলে কি পৃথিবীতে এত শান্তি কুশল সুখ সৌভাগ্য সদাচার প্রতিষ্ঠিত হইত? এই নীতি-জ্ঞান মনুষ্যকে আত্মীয় পরিবার সমাজ এবং সর্ব্বোপরিস্থ ঈশ্বরের নিকট দায়ী করিয়া রাখিয়াছে। যে এই শাস্ত্র মান্য করে না তাহাকে লোকে স্বার্থপর আত্মোদরপূরক পশু সমান বলিয়া ঘৃণা করে। নৈতিক কর্ত্তব্যে সকলকে এক সূত্রে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে এবং পরস্পরকে পরস্পরের জন্য দায়ী করিয়াছে। সমস্ত মানবজাতি একটি দেহ স্বরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার এক একটি অঙ্গ, একের মঙ্গলে অন্যের মঙ্গল হয়; সুতরাং পরিবার এবং জনসমাজ সম্বন্ধে চিরকাল যথেচ্ছাচারী হইয়া কেহ থাকিতে পারে না।

# ধর্ম্মজ্ঞান।

মনুষ্যের শারীরিক এবং সামাজিক সমস্ত অভাব কিরূপে বিমোচন হইল আমরা তাহা বর্ণন করিলাম। তদনন্তর কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যের উন্নতির সহিত ক্রমশ: ধর্ম্মনীতি জ্ঞান সভ্যতায় উন্নত হইয়া পরিশেষে কিরূপে তাহারা এক মাত্র জীবনাদর্শ চরমলক্ষ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিল, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বিবৃত হইবে। যখন কতকগুলি মনুষ্য দৈহিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা আপনাদের দৈনিক অভাব পূর্ণ করিয়া কিছু শস্য এবং ধন সঞ্চয় করিল, তখন তাহা দ্বারা আর এক সম্প্রদায় লোক প্রতিপালিত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে জ্ঞানচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইল। অরণ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ রাজা এবং সম্পন্নদিগের সহায়তায় কত তত্ত্বই উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা যে সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন আমরা এখন তাহা পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারি না। প্রাচীন ঋষিগণ যেমন ন্যায় দর্শন ইতিহাস পুরাণ কাব্য সাহিত্য জ্যোতিষ, ব্যাকরণ সৃষ্টিতত্ত্ব রাজনীতি আয়ুর্ব্বেদ ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি অপরা বিদ্যার আলোচনা করিতেন, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়েও অনেক গভীর সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য জাতির মনের ভাব এবং বিশ্বাস কেমন অল্পে অল্পে বিকসিত হইয়াছিল তদ্বিবরণ এক্ষণে সকলে

শ্রবণ কর। মানবচরিত্রের সুখ শান্তি মহত্ত্ব এবং উন্নতি এই বিশ্বাসের বিশুদ্ধতার উপর অনেক নির্ভর করে। ঈশ্বর বিষয়ে যাহাদের মত যে পরিমাণে উন্নত হয় তাহাদের জীবনও সেই পরিমাণে মহৎ হইয়া থাকে। কেন না, তিনিই মানব জীবনের পূর্ণ আদর্শ। তাঁহার স্বভাবকে যে অনুকরণ করিয়া চলিতে পারে সেই মহৎ এবং সুখী হয়। এই জগৎকে যিনি সৃজন করিয়াছেন তিনি পৃথিবীস্থ পিতা মাতা অপেক্ষা অনন্তগুণে স্নেহবান্। সকল নর নারী তাঁহার সমাদরের পাত্র। তিনি সমদর্শী ন্যায়বান্ মঙ্গল-স্বরূপ প্রেমময় ঈশ্বর। পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু জন-হিতৈষী পরদুঃখেদুঃখী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে যে প্রীতি সদ্ভাব দৃষ্টি গোচর হয় সে সকলের মূলাধার তিনি। সেই পর-মেশ্বর পূর্ব্বে যেমন সকলের নিকটে ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন। যাহারা তাঁহার বিষয় ভাবে, চিন্তা করে, তাঁহার নিয়ম ও ইঙ্গিত বুঝিয়া বুঝিয়া চলে এবং তাঁহাকে ভালবাসে, তাহাদেরই সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতর জ্ঞানযোগ সম্পাদিত হয়।

অশিক্ষিত আদিম মনুষ্য যে প্রথমে অসঙ্গত কল্পনা ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিল তাহাতে তাহার কেবল স্বাভাবিক ধর্ম্মতৃষ্ণারই পরিচয় প্রদান করে। যদিও সে সমস্ত অতি ভ্রমাত্মক ও কাল্পনিক, কিন্তু তদ্দ্বারা মানবপ্রকৃতিগত মহৎ ভাব প্রকাশ পাইতেছে; সুতরাং ইহাকে আমরা পরমার্থতত্ত্ব লাভের জন্য প্রথম চেষ্টা বলিতে পারি। অন্ধকার হইতে আলোকে যাইবার নিমিত্ত এই যে উদ্যোগ, ইহা কোন পৈশাচিক ক্রিয়া নহে।

মনুষ্যকে ভ্রমে ফেলিবার জন্য অথবা তাহাকে বিনষ্ট করিবার জন্যও ইহা সৃষ্ট হয় নাই। সুশ্রী সুখদ পদার্থনিচয় রচিত হইবার পূর্ব্বে যেমন কদর্য্য আকারে সে সকল গঠিত হইয়াছিল, প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে তেমনি কাল্পনিক ঈশ্বর লোকে নির্ম্মাণ করে। চারিদিকে জীবন ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ মহাপ্রভাবশালী ক্রিয়াশীল জীবন্ত স্বভাব, সম্মুখে বিষম প্রহেলিকাবৎ ভয়ঙ্কর মৃত্যু, মুমূর্ষু সন্তানের শয্যাপার্শ্বে রোরুদ্যমান পিতা মাতার আর্ত্তনাদ, আত্মীয় বন্ধুদিগের নিস্তব্ধ ভাব, এই সুগম্ভীর দৃশ্য অবলোকন করিয়া প্রথমে মনুষ্যমনে যে অনির্ব্বচনীয় ভয় ভক্তি সমুদিত হইল, তাহা কি সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধূর্ত্ততা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনার বলে উৎপন্ন করিয়াছিল? যাহা কিছু দেখিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিল তাহার স্বরূপ ভাব যদিও সে গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং তাহার অবিকল প্রতিরূপ প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু তাহার মূলেতে যে সত্য নিহিত ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিছু কাল পরে যখন বুদ্ধিমান চতুর লোকের সমাগম হইল, তখন তাহারা কোন স্বার্থ সাধনের জন্য এই রূপ ভাণ করিতে লাগিল, যে আমরা ঈশ্বরের বিষয় সকলই অবগত আছি। এই সময়ে সত্যের সহিত মিথ্যা প্রতারণা মিশ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তাহাতে যথার্থ তত্ত্ব একেবারে মিথ্যায় পরিণত হইতে পারে নাই।

[ প্রথম প্রশ্ন ]

অসভ্য হীনাবস্থা হইতে মনুষ্য যখন উন্নতির একটি

সোপানে আরোহণ করিল এবং তাহার শরীরের প্রধান অভাব সকল পরিপূর্ণ হইল, তখন তাহার জীবনের আভ্যন্তরিক মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কেবল আহার পানের জন্য যে মনুষ্য জীবন সৃষ্ট হয় নাই, ইহা অপেক্ষা আর একটি উন্নত লক্ষ্য তাহার আছে, এ কথা তখন সে আপনার অন্তঃকরণ হইতে শুনিতে পাইল।

ঊর্দ্ধে উজ্জ্বল মণিময় চন্দ্রাতপ সদৃশ নীল নভোমণ্ডল বিস্তৃত রহিয়াছে, নিম্নে বিপুল ফলশস্যপ্রসবিনী বসুন্ধরা প্রকাণ্ড পর্ব্বতশ্রেণী, দিগন্ত ব্যাপী মরুভূমি এবং নদ নদী সমুদ্র বনরাজিতে শোভা পাইতেছে; কোথাও গিরিনির্ঝর-নিনাদিত বৃক্ষলতা সমাচ্ছন্ন উপত্যকা ভূমি, কোথাও বা নানা বর্ণানুরঞ্জিত সুগন্ধি প্রসূনরাজী; কোথাও তরুকুঞ্জবনে আকাশবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গকুলের সঙ্গীত, কোথাও চকিতলোচন মৃগযূথের ক্রীড়া কূর্দ্দন, এবং কোথাও বা অরণ্যচারী সিংহ ব্যাঘ্র বরাহ ভল্লুকগণের গভীর গর্জ্জন;—স্থূলদেহধারী জন্তুদিগের মৃতদেহ, মানব শরীর, ইতস্ততঃ সঞ্চরমান সৌদামিনীশোভিত জলদজাল, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত, সকলে মিলিয়া এক অলৌকিক জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন ইচ্ছাময় পুরুষের পরিচয় দান করিতেছে;—কল কল রবে নদীর জল বহিয়া যাইতেছে, ভয়ঙ্কর কোলাহল সহকারে সমুদ্রের তরঙ্গ সকল অবিশ্রান্ত আস্ফালন করিতেছে, বৃক্ষপত্র সমীরণ ভরে সঞ্চালিত হইতেছে, কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ হইতে বারিধারা বর্ষিত হইতেছে, বজ্রের ভীম গর্জ্জনে চারি দিক্ বিকম্পিত হইতেছে; এই সমস্ত ভয় ও বিস্ময়োৎপাদক

অদ্ভুত ব্যাপার মনুষ্য যখন দেখিল, তখন স্তম্ভিত হইয়া সে আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিল, এ সকল কি? ইহাদের এরূপ করিবার অভিপ্রায় কি? আমি কে, এবং কোথায় আসিয়াছি? এবং আমি যে সকল বস্তু দেখিতেছি ইহারাই বা কোথা হইতে আসিয়াছে?

সৃষ্টির সৌন্দর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য দেখিয়া মনুষ্যমনে প্রথমতঃ কেবল আশ্চর্য্য রসের উদয় হইল, পরে বাহ্য পদার্থ ও ঘটনা সমূহের কারণানুসন্ধানে তাহার ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তখন এমন ক্ষমতা তাহার হয় নাই যে জ্ঞান যুক্তির সাহায্যে সে প্রকৃত কারণ অবধারণে কৃতকার্য্য হয়; মনের ভাব পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিবারও তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না; তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে কেবল সহজজ্ঞান এক মাত্র তখন সহায়। এই সহজজ্ঞানের সাহায্যে সে প্রথম হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল, যে অন্তরস্থ কোন এক অদৃশ্য শক্তিপ্রভাবে মনুষ্য ইচ্ছামত চলিতে পারে, বিষয় বিশেষ মনোনীত করিতে পারে, এবং স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে অথবা নাও করিতে পারে। ইহা বুঝিতে পারিয়া, প্রকৃতির মধ্যে যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে তাহার কর্ত্তা কে, তৎসম্বন্ধে সে নানা প্রকার কাল্পনিক মত সঙ্গঠন করিল। মনুষ্যসন্তান যখন দেখিল মেঘ চলিতেছে, বায়ুবেগে বৃক্ষপত্র সঞ্চালিত হইতেছে, নদীস্রোত বহিতেছে, আকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ভ্রমণ করিতেছে, শূন্য পথে পক্ষী উড়িতেছে, ভূপৃষ্ঠে পশুগণ বিচরণ করিতেছে, বৃক্ষ হইতে ফল পুষ্প উৎপন্ন হইতেছে,

কেহ এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিশ্চিন্ত নহে, স্বভাব প্রতিনিয়ত যেন যন্ত্রের ন্যায় চলিতেছে; তখন তাহার মনে হইল, অবশ্য এ সকলের মধ্যে কিছু আছে। অতঃপর প্রত্যেক পদার্থ এবং প্রাকৃতিক ঘটনা এক একটী ভিন্ন ভিন্ন অদৃশ্য শক্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে এইরূপ বিশ্বাস করিয়া সে প্রকৃতিপূজা আরম্ভ করিল। সূর্য্য চন্দ্র বৃক্ষ অগ্নি মেঘ বায়ু বৃষ্টি নদী সমুদ্র জলপ্রপাত প্রভৃতি এই পূজার অন্তর্গত বিষয়। প্রকৃতিপূজার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ, অবশেষে মনুষ্যপূজা আরম্ভ হইয়াছে। এখনও এ সমস্ত পূজাপ্রণালী পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে প্রচলিত দেখা যায়।

[কল্পিত উপন্যাস।]

প্রথমাবস্থায় প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হওয়াতে তদন্তর্গত জীবনীশক্তি সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত গল্প সকল প্রচারিত হইয়াছিল। যে যে ঘটনা বা পদার্থের উপর এই অদ্ভুত গল্প রচিত হইয়াছে সে সমস্ত সত্য, কিন্তু বুদ্ধির অল্পতা বশতঃ গল্পগুলিতে ঘটনা এবং বস্তুর প্রকৃতাবস্থা প্রকাশিত হয় নাই। পশু পক্ষী এবং বাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে বালকের মনে যেরূপ সংস্কার জন্মে, আদিমাবস্থায় অসভ্য লোকদিগের মনেও তদ্রূপ হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রাকৃতিক ক্রিয়া কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে তখন এইরূপ মনে হইত। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, মনুষ্যের শৈশবাবস্থা

কবিত্বরসে পরিপূর্ণ থাকে, যাহা কিছু সে দর্শন করে সকলই ভাবের মধ্য দিয়া দর্শন করে। সৃষ্টির মনোহর শোভা সন্দর্শনে তাহার হৃদয়সরোবর আশ্চর্য্য রসে উদ্বেলিত হয়, ভাব ও কল্পনায় তাহার সমস্ত জীবন একবারে প্লাবিত হইতে থাকে, সুতরাং বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবার আর কোন উপায় থাকে না। এই কল্পিত উপন্যাস এক প্রকাণ্ড শাস্ত্র বিশেষ। সর্ব্বত্র সকল জাতির মধ্যেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের জ্ঞানশূন্য কল্পনা ও ভাবের প্রবাহ স্বাধীন গতিতে নানাদিকে ধাবিত হইয়া নানাবিধ গল্প রচনা করিয়াছে। এই কল্পিত উপন্যাস কিরূপে কোথায় শেষ বীরচরিত আখ্যায়িকায় পর্য্যবসিত হইল তদ্বিষয়ে এখানে কিছু কথিত হইবে না; তাহা জানিতে হইলে বড় বড় গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক।

কোন কোন দেশের অসভ্য লোকেরা সূর্য্য চন্দ্রকে পরস্পর স্বামী স্ত্রী অথবা ভাই ভগিনী বলিয়া বিশ্বাস করে। চন্দ্রের মধ্যস্থিত কলঙ্ক অনেকের নিকট মনুষ্যাকৃতি রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে। জ্যোতিষ্কগণের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কাল্পনিক গল্প প্রচারিত আছে। ইউরোপের উত্তর গ্রীণল্যাণ্ডবাসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন এক বিবাহসভায় কন্যাকে প্রণয় দেখাইবার জন্য বর সে দেশের প্রথানুসারে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। অন্ধকার বশতঃ কন্যা তাহাকে চিনিতে না পারিয়া হাতে কালী মাখাইয়া সেই হাত বরের গালে দিলেন। পরে আলোকে

আসিয়া দেখেন যে তাঁহারা দুই জন পরস্পর ভাই ভগিনী। ভ্রাতার গালে কালী দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া কন্যা পলায়ন করিলেন, পাত্রও তাঁহার পশ্চাতে দৌড়িলেন। শেষ কন্যা পৃথিবীর এক সীমায় আসিয়া আকাশে উঠিয়া সূর্য্যরূপ ধারণ করিলেন, আর পাত্র যিনি তিনি চন্দ্র হইয়া তাহাকে ধরিবার জন্য চিরকাল তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইতেছেন। সেই গালের কাল চন্দ্রের কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে।

চন্দ্র বা সূর্য্য গ্রহণ হইলে হিন্দুগণ যেমন বিশ্বাস করেন যে উহারা রাহু কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইতেছে, এই মনে করিয়া তাঁহারা শঙ্খ ঘণ্টা বাজান, অন্যান্য দেশের লোকের মধ্যেও সেইরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে। গ্রহণের সময় চীনদেশীয় লোকেরা মনে করে কোন অদ্ভুত বিকটাকার জন্তু চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করিতে যাইতেছে, এই মনে করিয়া তাহার করাল গ্রাস হইতে চন্দ্র সূর্য্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাহারা কাঁসর ডঙ্কা ইত্যাদি বাজায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি বিশ্বাস করে, যে চন্দ্রকে কুকুরে আক্রমণ করিয়াছে এবং সে তাহার গাত্র বিদীর্ণ করিয়া রক্তপাত করিয়াছে, তাই গ্রহণের সময় চন্দ্রালোক রক্ত বর্ণ হইয়াছে। গ্রহণ এবং ধূমকেতুর আবির্ভাবকে ইউরোপবাসীরাও অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে বিবিধ অমঙ্গলের কারণ মনে করিত। গ্রীস্‌দেশীয় লোকদিগের কেবল এ বিষয়ে এক্ষণকার মত বিশুদ্ধ মত ছিল।

ভয় কেবল অজ্ঞানতা হইতে উৎপন্ন হয়; জ্ঞানালোকে যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে আর তাহা তিষ্ঠিতে

পারে না। আমরা এখন বুঝিয়াছি যে, পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে চন্দ্র যখন সূর্য্যের সমসূত্রপাতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে যখন পৃথিবী অবস্থিতি করে সেই সেই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। গ্রহণ সম্বন্ধে জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতদিগের গণনা ঠিক না হইলেই এখন যে কিঞ্চিৎ ভয়, নতুবা ইহা দেখিলে এখন আর কাহারও কোন প্রকার ভয় হয় না।

গ্রহ তারা সম্বন্ধে আসিয়াবাসীদিগের কল্পনা আরও কৌতুকাবহ। তাহাদের সংস্কার যে সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই স্ত্রীলোক, তারাগণ চন্দ্রের সন্তান, সূর্য্যেরও এক সময় ঐরূপ অনেক সন্তান ছিল। মনুষ্যজাতি তাহাদের আলোক সহ্য করিতে পারিবে না এই আশঙ্কা করিয়া উভয়ে উভয়ের সন্তানগণকে আহার করিতে অঙ্গীকার করিল। সূর্য্য আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিল, কিন্তু চন্দ্র আপনার সন্তানদিগকে লুকাইয়া রাখিল। সূর্য্য আপন অঙ্গীকারানুসারে যাই আপনার সন্তানদিগকে ভোজন করিয়া ফেলিল, চন্দ্র অমনি তাহার লুক্কায়িত সন্তানদিগকে বাহির করিল। ইহা দেখিয়া সূর্য্য অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া চন্দ্রকে মারিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল, সেই অবধি চিরকাল ইহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোন কোন সময় সূর্য্য যখন চন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহাকে দংশন করিবার জন্য ধাবিত হয় তখনই গ্রহণ আরম্ভ হয়। এখনও উষাকালে সূর্য্য তাহার তারাদিগকে ভক্ষণ করে। চন্দ্র আপনার তারাদিগকে সূর্য্যের ভয়ে সমস্ত দিন লুকাইয়া রাখিয়া,

রাত্রিকালে যখন দেখে যে সূর্য্য দূরে গিয়াছে, তখন অমনি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হয়।

গ্রহ তারা নক্ষত্রদিগকে জীবিত বোধে পূর্ব্বে যে সকল নাম দেওয়া হইয়াছিল অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। এক সময় উহারা মনুষ্য ছিল, এই পৃথিবীতে বাস করিত, এমন কথাও অনেকে বলে। কৃষক ও সমুদ্রস্থ নাবিকগণ বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহাদিগের গতি নিরীক্ষণ করিত, এবং তাহারা ইহাদিগকে জল বায়ুর শাসন-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিত। অদৃষ্টের নেতা বলিয়া এখনও তাহাদিকে লোকে মান্য করিয়া থাকে। যে গ্রহে যাহার জন্ম হয়, তদুপযুক্ত তাহার স্বভাব হয়, এ প্রকার অনেকে বিশ্বাস করে। জ্যোতিষ্কগণ আকাশে সংবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপও অনেকে বিশ্বাস করিত। এই আকাশকে অজ্ঞ লোকেরা সুখের স্থান স্বর্গলোক বলিয়া থাকে। এখানে কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা দুঃখ জরা প্রবেশ করিতে পারে না। ছায়াপথ এখানকার রাজপথ। এইরূপ অনেকে অনেক কথা বলিত।

মনুষ্য ও পৃথিবীসম্বন্ধে তৎকালকার লোকের মনে নানা প্রকার কুসংস্কার ছিল। জলস্তম্ভ দেখিয়া তাহাদের এইরূপ মনে হইত যে, হয় ইহা কোন বৃহৎ সর্প, অথবা কোন ভয়ঙ্কর বীর সমুদ্র হইতে আকাশে উঠিতেছে। রামধনু দেখিয়া বলিত, কোন জীবন্ত দানব জল পান করিবার জন্য নামিয়া আসিতেছে। উহা স্বর্গের সোপান কিম্বা সেতু, স্বর্গের দূতগণ উহার উপর দিয়া ভাগ্যবানদিগের

আত্মাকে স্বর্গধামে লইয়া যাইবে, এই ভাবে তাহারা ইহার ব্যাখ্যা করিত। কোন কোন জাতি উহাকে পরমেশ্বরের ধনুক বলিয়া বিশ্বাস করিত। মেঘাবলী গোচারণগামী গোপাল, তরঙ্গরাজি সমুদ্রের হৃদয়স্থ নাড়ির গতি, ভূমিকম্প নিম্নস্থ কচ্ছপের স্থানান্তর গমনের ফল, বিদ্যুৎচ্ছটা ঝটিকার অধিষ্ঠাত্রী দানবের জিহ্বা, বজ্রধ্বনি তাহার মুখের শব্দ, এবং আগ্নেয় গিরি ক্রোধান্ধ দানবদিগের বাসস্থান,—সেখানে থাকিয়া তাহারা লোহিত বর্ণ দগ্ধ শৈলরাশি দিগ্দিগন্তরে উৎক্ষেপ করে; এইরূপ তখনকার লোকের সংস্কার ছিল। মনুষ্যমনে, বিশেষতঃ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মনে বিস্ময়-রসের এমনি প্রাধান্য যে, পরী কিম্বা রাক্ষস, দানব অথবা ভূত প্রেত পিশাচাদির অস্তিত্বে সহজেই তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মিয়া যায়; সে বিশ্বাস উন্মূলিত করা অতি কঠিন কার্য্য; এমন কি অনেকানেক জ্ঞানবান্ লোকেও ইহা-দিগকে বিশ্বার করে। প্রকাণ্ড জন্তুদিগের দেহাস্থি দেখিয়া তাহারা বলিত, ইহা রাক্ষসদিগের অস্থি, জলপ্রপাতে ক্ষয়-প্রাপ্ত প্রস্তর দেখিয়া বলিত, যে ইহা ঐ রাক্ষসদিগের পদ-চিহ্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৃহৎ শৈল খণ্ড দেখিয়া স্থির করিত, ইহা রাক্ষসেরা শত্রুদিগের বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে। যে যে ঘটনার প্রকৃত কারণ তাহারা বুঝিতে পারিত না, এইরূপে তাহাদের বিষয় মীমাংসা করিয়া লইত। এই সমস্ত কল্পিত উপন্যাস হইতে বালকদিগের প্রিয় উপকথার সূত্রপাত হইয়াছে। যাউক, আর এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে চাই না। এক্ষণে অদ্ভুত কল্পনার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া

অত্যদ্ভুত সত্যের রাজ্যে গমন করি। বিজ্ঞানালোকে যে সকল আশ্চর্য্য সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কল্পনা হইতেও সুন্দর, কেন না সত্যের ভূমির উপরেই কল্পনার মনোহর মন্দির উত্থিত হইয়াছে, কল্পনার উপর নহে।

( উপদেবতায় বিশ্বাস। )

প্রকৃতি ও মানবসমাজের মধ্যে মঙ্গলামঙ্গল এই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য অজ্ঞান লোকেরা দুইটি ঈশ্বর কল্পনা করিয়া থাকে। যাঁহা দ্বারা মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে তিনি জীবের কল্যাণদাতা সুখদাতা ঈশ্বর; আর যাঁহা দ্বারা নানাবিধ অমঙ্গল সংসাধিত হয় তিনি শনি। পরিবারের মধ্যে পীড়া, মৃত্যু, ধনহানি প্রভৃতি কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হইলে তাহা শনির কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। সমাজের এই সাধারণ শত্রু শনি ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব, ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচ ডাইন প্রভৃতি অদ্ভুত জীবদিগের প্রধান; তাহার আদেশে উহারা ঈশ্বর ও মনুষ্যের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করে। উপদেবতার ভয় হইতেই ঐন্দ্রজালিক ব্যবসায়ের সূত্রপাত হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধিশক্তি কিছু প্রখর ছিল এবং যাহারা সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যপ্রকৃতি ও জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তাহারা ভূতের ওঝা দৈবজ্ঞ ঐন্দ্রজালিক হইয়া কোন না কোন প্রকার চাতুরী ও ধূর্ত্ততা দ্বারা সরলবুদ্ধি লোকদিগের ভয় বিভীষিকা দূর করত অর্থ উপার্জ্জন করিত। ভূতনামান, ডাইন কিম্বা পেঁচো

ছাড়ান, এ সকল তাহাদের কার্য্য। তাহারাই চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ এবং অলৌকিক ক্ষমতাশালী হইয়া এইরূপ প্রচার করিত, যে আমরা অদৃশ্য অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্ব নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অধিকারী।

মনুষ্যের এই ক্ষমতার উপর সাধারণ লোকের এমন দৃঢ় বিশ্বাস যে অদ্যাবধি তাহা অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অধিক কি যাঁহারা নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা পর্য্যন্ত ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। পৃথিবীর প্রচলিত উপধর্ম্মাবলম্বিগণ এবং তাঁহাদের পুরোহিতগণ ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এইরূপ অমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে ভূত ও ডাইনের ভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও শুনিতে পাওয়া যায়, ডাইন বলিয়া নির্ব্বোধ লোকেরা গ্রামের কোন বৃদ্ধা নারীবিশেষকে মারিয়া ফেলে। ডাইন অপবাদে দূষিত হইয়া এক ইউরোপেই অন্যূন নব্বই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ মহামারী অনাবৃষ্টি জলপ্লাবন ঝটিকা ভূমিকম্প ইত্যাদি যত কিছু ঘটনা উক্ত কল্পিত জীবের উপর সকলে আরোপ করিয়াছে। এই সমস্ত বিপদ ভয় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য অজ্ঞান লোকে ঐ সকল ধূর্ত্ত চতুর লোকদিগকে যথেষ্ট মান্য করিয়া থাকে। বাল্যসংস্কার বশতঃ কত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মনের এইরূপ ভয় অদ্যাপি রহিয়া গিয়াছে। অন্ধকার রজনীতে শ্মশান ভূমিতে একাকী গমন করিতে কেইবা শঙ্কিত না হন? যিনি বলেন আমি কিছু মানি না, তিনিও সময়ে সময়ে ভয়ে সচকিত হন। অরুণোদয়ে যেমন অন্ধকার পলায়ন

করে, জ্ঞানালোকে তেমনি এ সকল অমূলক ভয় ভাবনা বিদূরিত হইয়া যাইতেছে।

( আত্মজ্ঞান। )

বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র প্রাণের চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া মনুষ্য মনে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইল যে, সকলের অভ্যন্তরেই এক একটী জীবন্ত শক্তি বাস করিতেছে। এই সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ভিতরকার চৈতন্যময় বস্তুও অনুভব করিল। কিন্তু সেই বস্তু কোন্ পদার্থে রচিত, তাহার আকৃতি প্রকৃতি কি প্রকার, বাসস্থান কোথায়, তৎসম্বন্ধে অসভ্য লোকদিগের মধ্যে অনেক অসঙ্গত কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের জড়বাদী পণ্ডিতগণ আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শারীরিক জীবনীশক্তি হইতেই আত্মার উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত কেবল অনুভবের উপর সংস্থাপিত। আত্মা একটি অবিভাষ্য চেতন পদার্থ, জড় গুণের সমষ্টি মাত্র নহে। জ্ঞান বিবেক ইচ্ছা ভাব স্মরণশক্তি জড় বস্তুর সংযোগে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা ব্যষ্টিতে নাই তাহা সমষ্টিতে কি রূপে সম্ভব হইবে? অতএব আত্মা জড়ের অতীত স্বতন্ত্র পদার্থ, শরীর হইতে পৃথক, কিন্তু শরীরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগে সম্বদ্ধ।

পূর্ব্বকালের লোকেরা মনে করিত যে নিদ্রার সময় আত্মা শরীর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায় এবং স্বপ্নে যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় সকলই বাস্তবিক। পাছে আত্মা বাহিরে পড়িয়া থাকে এই ভয়ে তাহারা নিদ্রিতকে

উঠাইত না। এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আরও সংস্কার ছিল যে, নিদ্রাবস্থায় আত্মা যখন শরীর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ভ্রমণ করে, তখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহের মধ্যে দানব প্রবেশ করিতে পারে; হাঁই তোলা এবং হাঁচি তাহার আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণ। হাঁচির সময় যে লোকে ঈশ্বরের নাম করে তাহা ঐ দানবকে তাড়াইবার জন্য। য়িহুদিরা বলে, জ্যাকোবের সময় হইতে হাঁচির সঙ্গে "ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন!" এই কথা প্রচারিত হয়। তাহার পূর্ব্বে লোকে একবার মাত্র হাঁচিত, তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইত। কেহ কেহ মনে করিত আত্মা বাষ্পীয় পদার্থ।

শরীর ছাড়িয়া আত্মা বহুক্ষণ দূরে থাকা পীড়ার একটি অন্যতর কারণ বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। সেই আত্মাকে পুনরায় ফিরাইয়া আনা পুরোহিত ও ঐন্দ্রজালিকদিগের বিশেষ কার্য্য ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, শরীর এবং আত্মা যে দুইটি পৃথক্ পদার্থ তাহা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান। মৃত্যুর পর আত্মা বর্ত্তমান থাকে, এ বিশ্বাস স্পষ্টরূপে প্রথম হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বিশ্বাসেই মৃত ব্যক্তির ব্যবহারার্থ তাহার আত্মীয়গণ সমাধির সঙ্গে অশ্ব, যুদ্ধাস্ত্র ও দাসদিগকে মৃত্তিকানিহিত করিত। মৃত্যু কালে আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, এই জন্য যে ঘরে আসন্ন মৃত্যু থাকিত, পাছে তাহার আত্মা ঘরে বদ্ধ হইয়া থাকে এই ভয়ে তাহারা সে ঘরের জানালা দুয়ার খুলিয়া রাখিত। আত্মা অতি অলৌকিক পদার্থ; কেহ তাহাকে

দেখিতে পায় না, শরীরের সঙ্গে অতি নিকট যোগে বদ্ধ, অথচ শরীরের কোন্ স্থানে আছে তাহা কেহ জানে না। এক স্থানে শরীর আছে, অপর স্থানে আত্মা বিচরণ করিতেছে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই অদৃশ্য আত্মা যেমন জ্ঞানের অতি নিকটস্থ বিষয় এমন আর কিছুই নহে। "আমি আছি" এবং "আমি করিতেছি" এই আত্মজ্ঞান প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। আপনাকে আপনি জানা জ্ঞানের প্রথম বিষয়। এই আত্মা স্বয়ং জ্ঞানী এবং আপনিই জ্ঞানের বিষয়। সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্র, আত্মা যন্ত্রী হইয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। বাহ্য জগৎ মৃত, চিন্তাশূন্য, অজ্ঞান ; আত্মা চৈতন্যময়, বুদ্ধি বিবেক জ্ঞান স্মৃতি এবং প্রেমেতে সুসজ্জিত। আত্মাই সার পদার্থ। প্রত্যেক মানব দেহে এক একটী আত্মা বাস করিতেছে, প্রত্যেকেই স্বাধীন। কতকগুলি বিষয়ে সকলেরই এক প্রকার ভাব, আর কতকগুলি বিভিন্ন প্রকার, কাহার সঙ্গে কাহার মিল হয় না। কিন্তু মূল উপাদান সকলের মধ্যে এক জাতীয়। একটু চিন্তা করিলে আত্মার এই প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়।

পরমেশ্বর এই অদৃশ্য আত্মাকে চিন্তাশক্তি বুদ্ধি বিবেক দয়া প্রেম স্নেহ এবং স্মরণশক্তি দিয়া শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। জড়ের অতীত চেতন শক্তির প্রতি মনুষ্যের যে বিশ্বাস তাহা আপনাপনি হইয়াছে কেহ বলিয়া দেয় নাই। যাঁহারা বলেন কতকগুলি নিত্য অখণ্ড নিয়ম দ্বারা জড়রাজ্য নিয়মিত হইয়া

রহিয়াছে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহারাও ইহার মধ্যে বুদ্ধি ও মঙ্গলভাবের চিহ্ন দর্শন করিয়া সময়ে সময়ে সেই অনন্ত চৈতন্যময় জ্ঞানের উৎস ঈশ্বরের প্রতি ভয় ভক্তি প্রকাশ করেন। সেই মহানাত্মা পরমেশ্বর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া জগৎকে পরিচালিত করিতেছেন, প্রকারান্তরে এ কথা সকলেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই পূর্ণ পুরুষের অনন্ত গভীর তত্ত্ব এক্ষণে যেমন, পৃথিবীর শৈশবাবস্থাতেও তেমনি দুরবগাহ্য ছিল। তখন তাঁহার শক্তি গুণ সৌন্দর্য্য ভাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে লক্ষিত হইত, এক্ষণেও অনেক স্থলে সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। যেমন পরমাত্মা সম্বন্ধে তেমনি জীবাত্মা সম্বন্ধেও এ পর্য্যন্ত কোন পরিষ্কার জ্ঞান সাধারণে্য প্রচারিত হয় নাই। অধিকাংশ লোক স্থূলদর্শী, শরীর হইতে "আমি" যে পৃথক্ বস্তু ইহা তাহারা বুঝিতে সক্ষম হয় না। যাহারা পশু ভাবের হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা পাইয়াছে তাহাদের নিকট আত্মা যেমন জাজ্জ্বল্যমান পদার্থ এমন আর কিছুই নয়। যোগী তপস্বী জ্ঞানী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জড়রাজ্য একবারে পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য চেতন জগতে কত সময় বিচরণ করেন। সেখানকার নিয়ম প্রণালী শৃঙ্খলা তেমনি স্পষ্টরূপে তাঁহারা দর্শন করেন, জড়তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত যেমন জড়ের ক্রিয়া দেখিয়া থাকেন। কোন প্রসিদ্ধ জ্ঞানী বলিয়া গিয়াছেন, সৌরজগৎ যেমন অনন্ত অসীম, মনোজগৎও তেমনি একটী প্রকাণ্ড রাজ্য। বাস্তবিক জড়তত্ত্ব হইতে মনের তত্ত্ব অতি গভীর। সেখানে

যে কত ভাব, কত চিন্তা, কত কল্পনার তরঙ্গ প্রতি নিমেষে উঠিতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে তাহা কে গণনা করিবে? এই আত্মতত্ত্বরূপ মহাসমুদ্রে যাঁহারা নিমগ্ন হইয়াছেন, অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। মনের এক একটী আন্তরিক চিন্তা ও ভাব হইতে কত অসংখ্য বাহ্য ক্রিয়ারই উৎপত্তি হয়! অতএব মনুষ্যের আত্মাই প্রকৃত মনুষ্য, শরীর কেবল তাহার ইচ্ছা সাধনের যন্ত্র বিশেষ।

স্বভাবের দুরবগাহ্য গতি পূর্ব্বকালে অজ্ঞান লোকদিগকে যেমন হতবুদ্ধি করিয়াছিল, বর্ত্তমান কালের প্রখর বুদ্ধি বিদ্বন্মণ্ডলীকেও তেমনি করিয়া রাখিয়াছে। সৃষ্টির গভীর প্রহেলিকার মর্ম্মভেদ করিবার কাহার সাধ্য নাই। তবে প্রভেদ এই যে, আদিম মনুষ্যদিগের নিকট সকল বিষয়ই দুর্ব্বোধ্য ছিল, এক্ষণে আর তাহা নাই। এখন আমরা জ্ঞানের সাহায্যে স্বভাবের অন্তর্ভেদ করিয়া কিছু দূর নিম্নে অবতরণ করিতে পারি, কিন্তু সেও বড় অধিক দূর নহে। নির্দ্দিষ্ট সীমার নিকট জ্ঞানিগণ উপস্থিত হইয়া আপনা-দের বুদ্ধির দৌড় কত দূর তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। কোন বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারে না। ভোজবাজির ন্যায় স্বভাবের কার্য্য সকল যেন লোকের চক্ষুকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যাহা কিছু আমরা দর্শন শ্রবণ স্পর্শ করিতেছি, সে সকল যে যে বস্তুর গুণ সে বস্তু কেহ দেখিতে পায় না। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা কোন একটী কার্য্যের বা ঘটনার দূর বা নিকটবর্ত্তী শত সহস্র কারণ স্থির করিতে

পারেন, কিন্তু কার্য্যোৎপাদনের অব্যবহিত কারণ কি তৎ-সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলিতে সক্ষম নহেন। মনুষ্যাত্মা যে কি এক আশ্চর্য্য পদার্থ তাহা যেমন পরিষ্কাররূপে এ পর্য্যন্ত কেহ বুঝিতে সক্ষম হন নাই, তেমনি বাহ্যজগতের অনেকানেক কার্য্যের প্রকৃত কারণ এখনও কেহ অবধারণ করিতে পারেন নাই। এত দিন পরে মহা মহা পণ্ডিত ব্যক্তিরা যাহার মর্ম্ম বোধ করিতে না পারিয়া কত সময় কত অসার মত প্রকাশ করিতেছেন, আদিম অধিবাসীরা তাহা দেখিয়া যে স্তম্ভিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া বহু দূরের বস্তু নিকটে দেখিলেন এবং অণুবীক্ষণের দ্বারা এক বিন্দু জলের মধ্যে চক্ষুর অগোচর অগণ্য কীটাণু দর্শন করিলেন; তিনি জীবশরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তন্মধ্যে কোথায় কিরূপ কার্য্য চলিতেছে, কি নিয়মে দেহের ক্ষতি পূর্ণ হইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে এ সমস্ত দেখিলেন, কিন্তু সেই অণুবীক্ষণের কাচের মধ্য দিয়া কি তিনি প্রাণকে দেখিতে পাইলেন? অদৃশ্য শক্তি প্রাণ এবং আত্মা চর্ম্মচক্ষের নিকট কিছুতেই প্রকাশিত হইল না।

মঙ্গলময় ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সকল মহৎ গুণে ভূষিত করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, সে সকল গুণ ব্যবহার করিবার ইচ্ছাও তাহাকে তিনি দিয়াছেন। ইহাদিগের বলে অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও সে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর আলোকের মধ্যে

প্রবেশ করিতেছে। যে বস্তু উপার্জ্জন করিতে অল্প পরিশ্রম হয় তাহার মূল্যও অল্প হইয়া থাকে। ঈশ্বর প্রথম হইতে একবারে অধিক জ্ঞান দিয়া যদি তাহাকে এখানে পাঠাইতেন, তাহা হইলে সে আর জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিত না, অলস হইয়া বসিয়া থাকিত। অতএব যদিও তাহার জ্ঞান অতি যৎসামান্য, কিন্তু ইহা সে জানে যে তাহার অধিক জানিবার ক্ষমতা আছে। জ্ঞান যে মহামূল্য রত্ন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বস্তু তাহাও সে জানে।

( ঈশ্বর জ্ঞান। )

নৈসর্গিক নিয়মের প্রভূত আধিপত্য এবং অনতিক্রমণীয় প্রভাব সন্দর্শনে প্রথম হইতেই মনুষ্যহৃদয়ে তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা, দুর্ব্বলতা এবং অধীনতার ভাব সমুদিত হয়। সদ্যপ্রসূত সন্তানের ক্ষুধা তৃষ্ণার কারণ যেমন আমরা বলিতে পারি না, তেমনি ইহার কোন কারণ বা যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারি না। যাহাই হউক, ফলতঃ এ ভাব প্রথমাবধি ছিল এবং এখনও আছে। মনুষ্য জানে না কোথা হইতে সে আসিয়াছে এবং কোথায় যাইবে। তাহার জন্ম মৃত্যু ঘোরান্ধকারে আবৃত। এমন এক জন সহায় এবং পথপ্রদর্শক সে চায় যাঁহার উপর সে আপনাকে চিরকাল নির্ভর করিতে পারে। সর্ব্বগুণময় চির-সহায় পিতার ন্যায় এক জনকে পাইবার জন্য তাহার মন নিতান্তই লালায়িত। বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও সংস্কারব্যতীত তাহার হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে এই বাসনা এবং ব্যাকুলতা আছে যাহা চরিতার্থ না হইলে সে বাঁচিতে পারে না।

অন্তরের এই অস্পষ্ট ভাব কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে একটি বিশেষ নামের আবশ্যকতা অনুভব করে। কেন না, কোন নির্দ্দিষ্ট নাম ব্যতীত ঐ ভাবকে আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু সেই অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উপযুক্ত নাম কোথায় পাওয়া যাইবে? অবশ্য সে সময়ে তথায় সাহিত্যের ভাণ্ডার প্রস্তুত ছিল, মনুষ্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপযুক্ত ভাবব্যঞ্জক নাম অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। না পাইয়া সে পরাঙ্মুখ হইল। তখন তাহার বোধ হইল, যেন প্রত্যেক শব্দ সংজ্ঞা মনের উদ্ভিন্ন ভাবরাশিকে প্রকাশ না করিয়া বরং আরও তাহাকে বন্দীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে যখন অনেকানেক নাম দ্বারা হৃদ্গত ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইল, তখন তাহার ফল কি দাঁড়াইল তাহা দেখা যাউক। প্রথমে ঈশ্বরের সন্তানগণ একটি অথবা কতকগুলি নাম মনোনীত করিয়া কোন রূপে মনকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন. কিন্তু উহা কেবল অন্যান্য বস্তুবাচক নামের ন্যায় অন্তরের সেই অব্যক্ত ভাব দ্যোতক অতি অসম্পূর্ণ সঙ্কেত মাত্র হইল। কিছু দিন পরে সেই প্রত্যেক নাম এক একটি স্বতন্ত্র দেবতার পদ প্রাপ্ত হয়।

কোন না কোন সময়ে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতি সর্ব্বাগ্রে আলোকময় অনন্ত আকাশকে ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। কিন্তু যখন আকাশ শব্দ গৃহীত হয় তখন তাহা দ্বারা মনের স্বরূপ ভাব কি অভিব্যক্ত হইয়াছিল? কখনই না। আকাশ শব্দের মধ্যে কি অসীম মহৎভাব আছে

তখনকার লোকেরা তাহা জানিত এবং তাহারা ইহাও বুঝিয়াছিল যে, প্রথম মনুষ্য অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষ পরিশ্রান্ত হইয়া অভাব পক্ষে এই আকাশ নামটি ঈশ্বরকে দিয়াছে; কিন্তু তাহাতে সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তখন উজ্জ্বল আকাশ একমাত্র উচ্চতর শব্দ ছিল, তাহা দ্বারা অনন্তের ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে উক্ত শব্দে তাহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত হয় নাই। তথাপি ভাবিয়া দেখ, এই নাম যাহারা বাহির করিয়াছিল তাহারা কেমন মহৎমনা এবং গুণবান্ কবি! ঈশ্বর যে অসীম অনন্ত, এ ভাব মনুষ্যের স্বাভাবিক, নতুবা আর্য্য অনার্য্য প্রত্যেক জাতি প্রথমে আকাশকে কেন ঈশ্বর বলিবে? পরে যখন বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারী সকলে এই আকাশ নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতে লাগিল, তখন যে উহা বিকৃত হইবে না তাহা কে প্রত্যাশা করিতে পারে? যাহারা ঈশ্বরকে প্রথমে এই নাম দিয়াছিল তাহাদের আন্তরিক বিশ্বাস নিরাকার ছিল, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ হইবার সময় তাহা পরিমিত আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরে যাহারা আসিল তাহারা আকাশ শব্দের অন্তর্গত প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া তাহাকে ঈশ্বরের বাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিল। তাহার পরে যাহারা আসিল তাহারা মস্তকোপরি আকাশের নিকট শস্য পশু বৃষ্টি এবং দৈনিক আহারের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। শেষ এমন কুসংস্কার এবং ভ্রম জন্মিল যে, যাহারা বলিত, "ঈশ্বর আকাশ হইতে উচ্চ,

পাতাল অপেক্ষা গভীর” তাহাদিগকে সাধারণ লোকে অবিশ্বাসী বলিয়া ঘৃণা করিত। পরিশেষে আকাশকেই সর্বস্ব মনে করিয়া লোকে নানা প্রকার কল্পিত উপন্যাস রচনা করিয়াছে এবং মূল ভাবার্থকে এককালে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম, মনুষ্য প্রথমে অনন্ত বিস্তৃত সুনীল আকাশকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিতে আরম্ভ করে। অশিক্ষিত মনের উচ্চতম ভাব সর্ব্বাগ্রে এক মাত্র অসীম নভোমণ্ডলের দিকে ধাবিত হওয়া ইহা অস্বাভাবিক নহে। কারণ, আকাশে রবিকিরণরঞ্জিত সুন্দর মেঘাবলী, পরমোজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্য তারকামালা এবং রজতময় বিদ্যুচ্ছটা অতি অপূর্ব্ব মনোহর শোভা বিস্তার করিত, কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের মধ্য হইতে বজ্রের গম্ভীর ধ্বনি নিনাদিত হইত, এবং আকাশ হইতেই সুনির্ম্মল বারিধারা পতিত হইয়া বসুধাকে শীতল করিত। এই সমস্ত দর্শনে এবং শ্রবণে মানবের মন যে বিস্মিত ও মোহিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মানবহৃদয়ের অত্যুচ্চ ভাব স্বভাবতঃই ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইয়া থাকে; ক্রমে চিন্তা ও কল্পনা শক্তি যত প্রসারিত হয় ততই উহা উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে সমুত্থিত হইয়া অবশেষে আকাশের অতীত মনোবুদ্ধির অগোচর অচিন্তনীয় অনন্তস্বরূপ ভগবানে সংস্থিত হয়। কিন্তু অসভ্য মনুষ্য ঈশ্বরের স্বরূপ ভাব হৃদয়ঙ্গম এবং ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া শেষ প্রকৃতির শক্তিরূপী দেবতাদিগের উপর বিশ্বাস করিতে বাধ্য

হইয়াছিল। প্রথমে এই বিশ্বাস তাহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির দৈনিক অভাব সকল পূরণ এবং মনের কল্পনাকে চরিতার্থ করিবার পক্ষে এক মাত্র উপায় ছিল; ইহা হইতেই আদিম কালের বেদগীত কবিতামালা রচিত হইয়াছে। তদনন্তর পিতৃগণের পরলোকগত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মে। এই বিশ্বাস জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাহ্যিক আকারের উপর সংস্থাপিত হইয়াছিল। আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস হইতে উক্ত প্রেততত্ত্বমূলক বিশ্বাস, এবং প্রেততত্ত্বমূলক বিশ্বাস হইতে কল্পিত স্বর্গ নরকে বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়াছে।

মানবের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রথমোচ্ছ্বাস জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ যথা স্থানে উপযুক্ত পাত্রে পতিত না হইয়া আকাশ অন্তরীক্ষ এবং ভূতলস্থিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মনোরম, ফলপ্রদ ও ভয়াবহ ঘটনা এবং পদার্থনিচয়কে আলিঙ্গন করিয়াছে। অনায়ত্ত অখণ্ড অনন্তধর্ম্মভাব খণ্ড খণ্ড হইয়া নিকৃষ্ট উপাসনাপ্রণালীর মধ্য দিয়া ক্রমে আবার উৎকৃষ্ট উপাসনাপ্রণালীর দিকে উত্থিত হইয়াছে। মনুষ্যের শৈশবকালের বুদ্ধি যেরূপ অপরিস্ফুট ছিল তাহার উপযোগী উপাস্য দেবতাও তেমনি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল লোকই এক অবস্থায় ছিল তাহা নহে। কোন কোন ব্যক্তি সাধারণ অপেক্ষা কিছু উন্নত হইয়া অতি উচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমাবস্থা হইতে সাধারণ জনসমাজ যেরূপ ধর্ম্ম প্রণালীর মধ্য দিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সামান্য জড় উদ্ভিদ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া নরোপাসনা পর্য্যন্ত,

তদনন্তর এক অদ্বিতীয় চৈতন্যময় ঈশ্বরের উপাসনা সভ্য জগতে প্রচলিত হইয়াছে। ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, উপকারী জীব জন্তু, মঙ্গলজনক পদার্থ, প্রথমে ইহারাই উপাস্য দেবতা ছিল। সে সময় প্রত্যেক পদার্থ এবং ভৌতিক ক্রিয়ার এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা অধীন মনে হইত, পরে ঘটনাশ্রেণী এবং পদার্থশ্রেণী বিভাগের এক এক জন স্বতন্ত্র দেবতা হইলেন। ক্রমে দেবতার সংখ্যা আরো কমিয়া আসিল। এক্ষণে জ্ঞানোন্নতিসহকারে সকলে বুঝিতে পারিতেছে, সমস্ত কার্য্যের কারণ এক মাত্র, এবং সেই আদি কারণই পরম দেবতা; এ বিষয়ে বিজ্ঞান দর্শন ধর্ম্মশাস্ত্র তিনেরই এক কথা। এক মধ্যবিন্দুর সঙ্গে যাবতীয় জগৎকার্য্যকে মিলাইয়া দেওয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মের ইতিহাস ক্রমে যত বর্দ্ধিত এবং পরিষ্কৃত হইয়া আসিয়াছে, মনুষ্যের মনের ভাবনিচয় তত উচ্চতর এবং মহত্তর হইয়াছে। ভূমণ্ডলে এবং আকাশে যত কিছু ব্যাপার সংঘটিত হইত, প্রথমে লোকে সে সকলকে অতি বিশৃঙ্খল নিয়মহীন বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যখন তাহারা বিচক্ষণতার সহিত কার্য্যের গতি অনুধাবন করিতে লাগিল, তখন দেখিতে পাইল যে কোন কার্য্যই অন্ধশক্তি দ্বারা অনিয়মে সম্পাদিত হয় না। তখন তাহারা বিশ্বের সর্ব্বত্র অতি সুন্দর নিয়মাবলী সুশৃঙ্খলা সুসামঞ্জস্য দেখিয়া সর্ব্বনিয়ন্তার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্প এবং কৌশল কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিল। যে সকল পদার্থ এবং ঘটনারাজিকে প্রথমে

অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বোধ হইত, এবং স্বভাবের যে সকল ক্রিয়াকে চিরবিবদমান অসামঞ্জস্য মনে হইত, পরে সে সকলেরও মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায় এবং সুন্দর সুশাসন লক্ষিত হইয়াছে।

যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি মার্জ্জিত এবং বিকশিত হইল তাহারা এইরূপে জগতের সমস্ত ঘটনাবলির মধ্যে এক জনের বুদ্ধিমত্তা ও অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম এবং সুকৌশল অবলোকন করত সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি যে সমুদায় বিশ্বের একমাত্র অধিপতি এ প্রকার বিশ্বাস কয় জনের ছিল? তথাপি যে দেশে যিনি যখন বিশেষ অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বরতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর এবং সত্যধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব লাভে কৃতকার্য্য হইয়া গিয়াছেন। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে একেশ্বরবাদী মহত্মাদিগের অসাধারণ কীর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এব্রাহেম মূশা মোহম্মদ নানক কবির ঈশা যাজ্ঞবল্ক্য, জনক রামমোহন রায় প্রভৃতি পুরুষোত্তমেরা সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। অবশ্য সে রূপ তত্ত্বদর্শী বুদ্ধিমান ধার্ম্মিক লোকের সংখ্যা অতি অল্প। কেন না, সাধারণতঃ অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ কেবল আহার পানেই উন্মত্ত, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয় না, দিবা রাত্রি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা অন্বেষণ করিতেই তাহাদের সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়;

সুতরাং অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত কেহই মায়া এবং কুসংস্কার পাশ বিমুক্ত হইয়া সত্যের অনুসরণ করে না। কত লোক অন্যান্য বিষয়ে মহা মহা জ্ঞানী হইয়াও ধর্ম্ম-বিষয়ে অদ্যাপি বালকের ন্যায় কতকগুলি কল্পনা লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

বহির্জ্জগতের সর্ব্বসমঞ্জসীভূত নিয়মাবলী এবং আত্মতত্ত্ব যিনি উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন তিনি এক আদি কারণ ঈশ্বরের আবির্ভাব সর্ব্বত্র দেখিতে পাইয়াছেন। যে সকল সাধু গুণ অপূর্ণভাবে মনুষ্যমনে বিরাজ করিতেছে তাহা অনন্ত গুণে পূর্ণভাবে ঈশ্বরেতে অবস্থিতি করে ইহাও তাঁহারা বুঝিয়াছেন। বিবেকের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের মহান্ অর্থযুক্ত সুগম্ভীর আদেশ আসিতেছে, যিনি নিস্তব্ধভাবে তাহা শ্রবণ করেন তিনি মনুষ্যের সহিত তাঁহার সুমিষ্ট সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন। এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা এবং ত্রাণ-কর্ত্তা যে এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না, অতি প্রাচীন কালের কোন কোন মহাত্মা এ জ্ঞান যেমন লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি বর্ত্তমান কালের জ্ঞানিগণ জগতের কার্য্যকারণ ও নিয়মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছেন যে, সমস্ত ঘটনা-রাজি এক সূত্রে গ্রথিত, স্বভাবের ক্রিয়ার মধ্যে সর্ব্বত্র একে-রই মহিমা প্রকাশ পাইতেছে; এখানে একের অধিক দুই-জনের আবশ্যকতাও নাই, এবং একজন ব্যতীত আর কাহার স্থানও নাই; জগতের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ, প্রত্যেকের উপর নির্ভর করিতেছে। যদিও ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস করিয়াও অনেকে তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় গঠন

করিয়াছিল, তথাপি পুরাকালের গ্রন্থসকলে এক অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরজ্ঞানের ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন মহর্ষিরা এ সত্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সত্য সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের আর্য্য ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান কালের কত বিখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। উপনিষদের সময়ে প্রাচীন আর্য্যগণ ঈশ্বরতত্ত্ব যেমন পরিষ্কাররূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই। বিবিধ কার্য্যের মূলে এক মহাকারণ এবং আদি শক্তি বর্ত্তমান, তাহা আবিষ্কার করাই বিজ্ঞান শাস্ত্রের শেষ উদ্দেশ্য, ধর্ম্মবিজ্ঞানের আলোচনায় তাহা সুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেহ বলেন আদিশক্তি, কেহ বলেন মূল কারণ, কেহ বলেন তিনি পরমপুরুষ বিধাতা ভগবান্, এই কেবল প্রভেদ। সৌরজগতে প্রত্যেক গ্রহ উপগ্রহগণ যেমন এক একটি সূর্য্য কর্ত্তৃক নিয়মিত এবং পরিচালিত হইতেছে, তেমনি আবার শত শত সূর্য্যের পরিচালক সেই আদিসূর্য্য পরমেশ্বর। একেতে অনন্ত কার্য্য কারণ গ্রথিত, মানববুদ্ধি এই কার্য্য কারণের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল ধরিয়া আসিতে আসিতে পরিণামে তথায় উপনীত হয়। এই জন্য সমস্ত সভ্য জগৎ এক ভিন্ন দুই জন ঈশ্বর স্বীকার করে না।

## উপসংহার।

শৈশব কাল হইতে মনুষ্যের যে এইরূপ ক্রমশঃ উন্নতি

হইয়া আসিতেছে ইহার শেষ কোথায়? জীবনস্রোতঃ কোন্ দিকে যাইতেছে, কি তাহার নিয়তি, এ সকল একটী চিন্তা এবং মীমাংসার বিষয়।

পশু কিম্বা জড়প্রকৃতি যে উদ্দেশ্যে সৃজিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিতেছে মনুষ্যের উদ্দেশ্যও কি সেইরূপ? আপনি যত দিন বাঁচিব ততদিন সুখে পান ভোজন আমোদ আহ্লাদ করিব, এবং যদি পারি তবে আত্মীয় প্রতিবাসীদিগকেও সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার চরম সীমায় লইয়া যাইব, তাহার পর মরিয়া গেলেই সব শেষ হইল; এই বলিয়া কি মনুষ্য জীবনলীলা শেষ করিবে? তাহা যদি হয়, তবে মনুষ্য একটি সুবুদ্ধিসম্পন্ন উন্নত পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক মাত্র সুখ সাধনকেই যদি মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে সে সুখ কখন ইন্দ্রিয়সুখ হইতে পারে না। কারণ, অতীন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগেই মানবের মহত্ব। ঈশ্বর যেমন অনন্ত সুখের ভাণ্ডার, মনুষ্যও তেমনি অমর হইয়া সেই সুখ শান্তি অনন্তকাল ভোগ করিবে, অল্পে তাহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। এই জন্য কোন বিখ্যাত তত্ত্বদর্শী আজীবন সুখ স্বার্থকে পরমধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া শেষ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সুখ অন্বেষণ করিলে মনুষ্য সুখী হইতে পারে না, সুখের প্রত্যাশা না করিয়া অন্যকে সুখ দিলে, জগতের উপকার করিলে আপনা হইতে সুখ সমাগত হয়। এই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত অন্য কেহ নহেন, সুবিখ্যাত জনষ্টুয়ার্ট মিল্। স্পাইনোজা নামক য়িহুদীবংশজাত আর একজন

প্রাচীন পণ্ডিত বলিয়াছেন, “বহুদর্শন দ্বারা আমি এই শিক্ষা পাইলাম যে, মানবজীবন সচরাচর যাহা দিতে চায় তাহা বৃথা এবং অসার। অতএব আর আর যাবতীয় বস্তু পরিত্যাগ করিলেও যাহাতে আমার আত্মা সন্তুষ্ট থাকে আমি তাহাই অন্বেষণ করিব। ধন মান ইন্দ্রিয়-সুখকেই মানবকুল সর্ব্বোচ্চ বিষয় মনে করে; কিন্তু ইহাতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহা ভ্রান্তিমাত্র। চির-স্থায়ী অপরিসীম মঙ্গলে কেবল আত্মাকে পবিত্র আনন্দ বিধান করিতে পারে।” অত্যুৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া এবং বিশ্বের সহিত প্রত্যেক আত্মার যে নিকটতর সম্বন্ধ আছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাই তাঁহার মতে “সর্ব্বোচ্চ মঙ্গল”। পরমেশ্বরের ইচ্ছা পালনই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে যেমন মনুষ্যের লক্ষ্য সংসিদ্ধ হয়, তেমনি তাহা হইতেই অনন্ত সুখের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে যত কিছু আয়োজন দেখা যাইতেছে, শরীর মনে এবং বাহ্য জগতে যে সকল সুব্যবস্থা এবং তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে যেরূপ উপযোগীতা নয়নগোচর হইতেছে, এ সমস্ত কেবল সেই চরমোদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন জীবনের যে লক্ষ্য বলা হইল তাহা কি প্রকার? প্রধানতঃ ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—ঈশ্বরের প্রতি, আপনার প্রতি, মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন। সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ঈশ্বরকে প্রেম করা, তাঁহার সন্তান জ্ঞানে সমস্ত মনুষ্যকে প্রেম করা, আর নিজের জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা, এই তিনটীর মধ্যে সমস্ত

কর্ত্তব্য নিহিত আছে। অর্থাৎ করুণাময় পরমেশ্বর যে উদ্দেশ্যে জগৎ সৃজন করিয়াছেন তাহাতে যোগ দান করিয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া চিরদিন মনুষ্যসমাজে শান্তি ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে হইবে। সেই বিশ্বপতি রাজ-রাজেশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যাহাতে সকলে তাঁহার মঙ্গল শাসনে শাসিত হয়, তাঁহার নামের জয়পতাকা যাহাতে সর্ব্বত্র উড্ডীন হয়, এবং তাঁহাকে গৃহদেবতা পিতা রাজা প্রভু বন্ধু সখা জানিয়া যাহাতে সকলে মিলিয়া এক প্রীতিবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহারই জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা যত্নশীল হইতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে যেমন তাঁহার মঙ্গল নিয়ম প্রতিপালন করিব, তেমনি যাহাতে সকলে তাহা পালন করে তজ্জন্য চেষ্টা করিব ; সংক্ষেপতঃ ইহাই জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য সমস্ত জগৎযন্ত্র দিবানিশি কার্য্য করিতেছে, প্রত্যেক মনুষ্য জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু যাহারা লক্ষ্য অবগত হইয়া ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহা-রাই মনুষ্যত্বের গৌরব বুঝিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের চিরবিদ্রোহিতা বিনাশ করিয়া শান্তিরাজ্য সংস্থা-পনের জন্য প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন অনন্ত, মনুষ্যের উন্নতির সোপানও তেমনি অনন্ত। তিনিই জীবনের পূর্ণ আদর্শ। প্রত্যেক মানবের এক একটি বিশেষ কার্য্যভার আছে, তাহা বুঝিয়া পালন করিতে পারিলেই আপনাকে ও জনসমাজকে সুখী করিতে পারা যায়। মনুষ্যস্বভাব ও বাহ্য পদার্থের মধ্যে এখনও যে কত অদ্ভুত ক্ষমতা এবং মহৎগুণ

নিদ্রিতাবস্থায় লোকলোচনের অগোচরে বাস করিতেছে তাহা কে জানে? এই সামান্য একটী পৃথিবী, সমস্ত বিশ্বের তুলনায় যাহা একটী বালুকা কণার ন্যায় প্রতীত হয়, তাহাতেই যদি এত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখা গেল, না জানি অনন্ত সৌর জগতের আর আর স্থানে সেই মহিমার সাগর বিশ্বাধিপের কতই না আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল ঘটিতেছে! ধন্য সেই অনন্ত গুণাধার বিপুল ক্ষমতাশালী ঈশ্বরকে যিনি এ সকল অতুল কীর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের মনকে চমৎকৃত করিতেছেন! এত দেখিয়া শুনিয়াও মনুষ্য কি এমনই পাষাণহৃদয় অহঙ্কারী হইবে যে তাঁহাকে অস্বীকার করিবে? এবং স্বীকার করিয়া কি তাঁহাকে ভক্তি করিতে ভুলিয়া যাইবে? দেখ! তিনি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদেরই দ্বারা কত আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলেন এবং লইতেছেন; তথাপি যদি আমরা তাঁহার মহিমাকে মহীয়ান্ না করিব, তবে আর কি পশুরা তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে? বরং আকাশের পক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারাও তোমাদিগকে বলিয়া দিবে;—"কে না জানে যে ঈশ্বরের হস্ত এই সকল রচনা করিয়াছে?" ঈশ্বর আমাদের পরম সহায়। তাঁহার মঙ্গল নিয়মের অনুসরণ করিলে চিরকাল সুখে কালযাপন করা যায়। যে তাঁহাকে নিকটস্থ সহায় জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস নির্ভর করে, তাহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, জ্ঞান উজ্জ্বল, হৃদয় প্রশস্ত, চরিত্র নির্ম্মল এবং জীবন আনন্দময় হয়।

---

সম্পূর্ণ।

উত্তরপাড়া সাধারণ পুস্তকালয় সন ১২৯৩